আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

শ্রীহরিপদ মণ্ডল

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

শ্রীহরিপদ মণ্ডল

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা—৯।

মূল্য—২.৫০ টাকা মাত্র।

প্রকাশ করেছেন :

শ্রীমতী অলকা মণ্ডল

ক্যালকাটা পাবলিশার্স

কলিকাতা—৯।

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। মুখার্জী বুকস্টল
বড়বাজার, মেদিনীপুর সহর।

২। মল্লিক লাইব্রেরী,
বড়বাজার, মেদিনীপুর সহর।

৩। বীণাপানি লাইব্রেরী,
বাঁথি।

৪। পুঁথিপত্র,
স্কুলবাজার, মেদিনীপুর সহর।

ছেপেছেন :—

শ্রীশ্যামসুন্দর সেন

নিরাপদ প্রেস

বক্সীবাজার, মেদিনীপুর সহর।

—ঃ নিবেদন ঃ—

মহামনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের কোন জীবন-চরিত এ পর্যন্ত রচিত হয়নি। তাঁর অতুলনীয় জ্ঞান-সাধনার কথা এক সময় প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিল। নামযশের আকাংক্ষায় তিনি অবশ্য কিছু করেন নি। তাঁর নিরহংকার, অনাড়ম্বর ও আত্মভোলা প্রকৃতি তাঁর ব্যক্তিজীবনকে যেমন মহিমান্বিত করেছে, তেমনি অন্যের কাছে অনেক পরিমাণে তাঁকে আবৃতও করেছে। তাঁর চরিত্র-সাধনার যথার্থ মূল্য বাঙ্গালী তথা ভারতবাসী দিতে পারেনি। আমরা তো বিস্মৃতিপরায়ণ জাতি বলে আখ্যাত। এই মহামনীষীর প্রতি আমাদের ঔদাসীন্যও বুঝি সেকথার যাথার্থ্য প্রমাণ করে।

"ছাত্রানাঃ অধ্যয়ণং তপঃ"—একথা যখন তরুণ-বিদ্যার্থীদের কাছে আমরা বলতে চেষ্টা করি, তখন যতই কেন আমাদের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে আসুক না, (কারণ, আদর্শের কথা শোনাবার বা শোনবার আগ্রহ আজ অবলুপ্তির পথে) আমাদের চোখের সামনে যে কয়জন জ্ঞানতপস্বীর প্রতিমূর্ত্তি উজ্জ্বল হয়ে ভেসে ওঠে, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর জন্যে নয়, অর্থাগমের পথ সুগম করবার উদ্দেশ্যে নয়, সরকারী চাকুরীর মোহে নয়, জানার্জনের জন্যই জীবন ভোর যে তপস্যা, তার দৃষ্টান্ত যে কোন দেশেই বিরল। অবশ্য জ্ঞানসাধনাই আচার্য শীলের চরিত্রের একমাত্র পরিচয় নর। বহুমুখী প্রতিভা নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন এবং তাঁর সেই প্রতিভা দেশ-বিদেশে বিপুল শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল।

তাঁর মহৎ ও বিশাল জীবনের কিছু পরিচয় এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার মধ্যে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে কেবল তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে। এই নিবন্ধ রচনায় মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম রাজ গ্রন্থাগার, ও ঋষি রাজনারায়ণ স্মৃতি সাধারণ গ্রন্থাগারের সাহায্যের কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। উপাদান সংগ্রহের জন্য যে সব পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য হচ্ছে 'উদ্বোধন' "প্রবুদ্ধ ভারত", 'প্রবাসী' ও "মডার্ণ রিভিয়ু"। পুরানো "প্রবুদ্ধ ভারতের" জন্য কলিকাতার "অদ্বৈত আশ্রমের" কর্ত্তৃপক্ষের কাছে আমি ঋণী।

মেদিনীপুর, ১।৬।৭২ **শ্রীহরিপদ মণ্ডল।**

—: সূচিপত্র :—

১। ব্রজেন্দ্রনাথের জীবনের ঘটনাপঞ্জী.... .... ক
২। বাল্যজীবন ও শিক্ষা.... .... ১
৩। কর্মজীবন ৯
৪। জ্ঞানসাধনা.... .... ১২
৫। বিশ্বসভায় ব্রজেন্দ্রনাথ.... .... ১৬
৬। জাতীয় আন্দোলনে ব্রজেন্দ্রনাথ.... ....২০
৭। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে.... .... ২৫
৮। ব্যক্তিগত জীবন ২৯
৯। রবীন্দ্রনাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথ ৩০
১০। ব্রজেন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন অভিভাষণ.... .... ৩৩
১১। রবীন্দ্রনাথের রচিত প্রশস্তি ৪৫
১২। লেখক ব্রজেন্দ্রনাথ ৪৬
১৩। মহাপ্রয়াণে শ্রদ্ধার্ঘ্য :—

(ক) মডার্ণ রিভিয়ু ৫৩

(খ) প্রবাসী ৫৬

(গ) মাসিক বসুমতী ৫৯

(ঘ) দর্শন কংগ্রেসে জন্ম-জয়ন্তী ৬১

১৪। পরিশিষ্ট :—

(ক) শ্রীরামকৃষ্ণের শতবার্ষিক উৎসবে বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে অভিভাষণ ৬২

(খ) পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত মন্তব্য ৭১

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের জীবনের ঘটনাপঞ্জী

১৮৬৪—৩রা সেপ্টেম্বর, —কলিকাতায় জন্মগ্রহণ।

১৮৭১—পিতা মহেন্দ্রনাথ শীলের মৃত্যু।

১৮৭৮—এণ্ট্রান্স পরিক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ও সরকারী বৃত্তিলাভ। ১৮৮০—এফ. এ. পরীক্ষায় কৃতকার্য।

১৮৮৩—দর্শন শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ বি. এ. পাশ। জেনারেল এসেমব্লীজ (বর্ত্তমান স্কটিশ চার্চ) কলেজে অধ্যাপকের পদে নিয়োগ।

১৮৮৪—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "দর্শন শাস্ত্রে" প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম. এ. উপাধি অর্জণ। এরপর সংস্কৃত, অর্থনীতি, হিন্দুদর্শন, জাতিতত্ত্ব ('Ethnology) নৃতত্ত্ব (Anthropology), তুলনণমূলক ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে অধ্যয়ণ।

১৮৮৪-৮৫—এক বৎসরের জন্য কলিকাতার সিটি কলেজে দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক।

১৮৮৬-৮৭—নাগপুর মরিশ কলেজের অধ্যক্ষ।

১৮৮৭-৯৬—বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন।

১৮৯৬-১৯১৩—কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ। কলেজের সর্বাঙ্গীন উন্নতির প্রয়াস। জ্ঞানসাধক হিসেবে দেশ-বিদেশের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ।

১৮৯৮—পত্নী বিয়োগ।

১৮৯৯—রোমে প্রাচ্যবিদ সম্মেলনে যোগদান ও জ্ঞানগর্ভ ভাষণ-দান। খৃষ্ট ও বৈষ্ণব ধর্মের তুলনা। বৈষ্ণব ধর্মের উপর খৃষ্টধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার নিরসন।

১৯০৩—New Essays in Criticism গ্রন্থ (যা প্রবন্ধাকারে ১৮৯০-৯১ সালে Calcutta Review তে প্রকাশিত হয়েছিল,) প্রকাশ। একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে "বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গীতকবি" হিসেবে আখ্যাদান। রবীন্দ্রনাথ তখনও সাধারণ্যে বিশেষ খ্যাত হননি।

১৯০৫—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলী প্রণয়নের জন্য গঠিত "সিমলা কমিশনের" সদস্য হিসেবে যোগদান। পরে স্যাড্‌লার কমিশনেরও সদস্য রূপে উল্লেখযোগ্য অবদান।

১৯০৫-১১—পর্যন্ত স্বদেশী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ। বিপিন চন্দ্র পালকে সাহায্য ও "জাতীয় শিক্ষা সমিতির" (National Council of Education) সংগঠনের একজন উদ্যোক্তারূপে কর্মভার গ্রহণ।

১৯০৭—স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনের স্মৃতিকথা রচনা।

১৯১০—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর লিখিত মৌলিক রচনা 'The Positive Sciences of the Ancient Hindus' এর উপর ভিত্তি করে Ph. D. ডিগ্রী দেওয়া হয়। এই রচনা ১৯১৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

১৯১৪—স্যার আশুতোষের আহ্বানে ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "দর্শন বিভাগের" প্রধান অধ্যাপক (King George V Professor For Mental and Moral Sciences) রূপে যোগদান করেন।

১৯২০—মহীশূর সরকারের আহ্বানে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের (Vice-Chancellor) পদ গ্রহণ। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত মহীশূরে অবস্থান। এই সময় তিনি মহীশূর রাজ্যের "শাসন সংস্কার পরিষদের" সভাপতি-রূপেও দায়িত্বপূর্ণ কাজ করেন। কিছুকাল শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হয়ে শিক্ষাসংস্কারেও ব্রতী হন।

১৯২১—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ে মৌলিক অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে D. Sc. উপাধি দান করেন। Ethnology ও Anthropology বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য সকলকে মুগ্ধ করে।

"বিশ্বভারতী" প্রতিষ্ঠা উৎসবে রবীন্দ্রনাথ ব্রজেন্দ্রনাথকে সভাপতিরূপে বরণ করেন। শান্তিনিকেতনে আচার্য শীল অপূর্ব এক ভাষণ দেন।

১৯২২—রবীন্দ্রনাথ মহীশূরে ব্রজেন্দ্রনাথের আহ্বানে যান, বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেন।

১৯২৫—তাঁর অসামান্য জ্ঞান-সাধনা ও কর্ম্মযোগের জন্য ভারত সরকার তাঁকে 'স্যর' (Knighthood) উপাধি-দানে সম্মানিত করেন।

১৯২৮—ইউরোপ যাত্রা বাতিল করে রবীন্দ্রনাথ কলম্বো থেকে ফিরে পণ্ডীচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারপর বাঙ্গালোরে ব্রজেন্দ্রনাথের অতিথি হয়েই দুই সপ্তাহ কাটান। কবি ব্রজেন্দ্রনাথের বন্ধুত্বে চির-দিন মুগ্ধ ছিলেন।

১৯৩০—স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু ব্রজেন্দ্রনাথ মহীশূরের সরকারী কর্ম্ম থেকে অবসর গ্রহন করে কলকাতায় অবস্থান করেন। জীবনের শেষভাগে দক্ষিন কলকাতার এক বাড়ীতে থাকেন। ছাত্র অধ্যাপক বহুজনে তাঁর কাছে উপদেশ শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা লাভের জন্য আসতেন। কয়েক বৎসর অন্ধ হয়ে থাকলেও জ্ঞান চর্চ্চায় তাঁর বিরাম ছিল না। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত একজন তরুণ ছাত্র

তঁকে বইপত্র পড়ে শোনাত অথবা তাঁর বক্তব্য লিখে দিত।

১৯৩৩—ডিসেম্বর মাসে রামমোহন শতবার্ষিক স্মৃতি সভায় আচার্য শীল এক অনবদ্য ভাষণ দান করেন। তা পরে পুস্তিকাকারে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৩৫—"ভারতীয় দর্শন কংগ্রেস" কলিকাতায় সিনেট হলে তাঁর ৭২—তম জন্ম জয়ন্তী উদ্‌যাপন করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। স্যার মাইকেল স্যাডলার ও রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে যথাক্রমে তাদের লিখিত স্মৃতিকথা ও প্রশস্তি রচনা করে পাঠান।

১৯৩৬—শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্ম শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত "বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে" মূল সভাপতিরূপে এক অপূর্ব মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন।

১৯৩৮—৩রা ডিসেম্বর দুই পুত্র, এক কন্যা, অগণিত গুণমুগ্ধ দেশবাসী ও বহু শ্রদ্ধাবান ছাত্র-ছাত্রী রেখে আচার্য পরলোকগমন করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর কাছে বহুভাবে ঋণী। তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য দর্শন বিভাগের "পঞ্চম জর্জ্জ অধ্যাপক" পদটির নাম পরিবর্ত্তন করে ১৯৫০ "আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল অধ্যাপক পদ" করা হয়েছে।

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ও একরূপ তাঁর হাতেই গড়া। সেখানেও তাঁর উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

(১৮৬৪–১৯৩৮)

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত সারা ভারতের যে কয়জন জ্ঞানতপস্বী বিশ্বের দরবারে মাতৃভূমির মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল অন্যতম। ব্রজেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য ও মহামনস্বিতা সত্যিই তুলনাহীন। সে যেন এক মহাসমুদ্রের মতো অসীম অতল। এই অনাসক্ত জ্ঞান যোগী অলৌকিক প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় সমগ্র পৃথিবীর গুণী সমাজের মধ্যে অপূর্ব বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিলেন। বৈদান্তিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের পরে মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ ছাড়া আর কেউই তাঁদের মনীষার জন্য পৃথিবীর কাছে এ পর্যন্ত এমন সম্মান পাননি। দুঃখের বিষয় এই মহামনীষীর কোনও জীবনচরিত আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।

বাল্যজীবন ও শিক্ষাঃ

ব্রজেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দর ৩রা সেপ্টেম্বর উত্তর কলকাতার বিখ্যাত শীল পরিবারে। তাঁর পিতা মহেন্দ্রনাথ শীল (১৮৩৯—৭১) ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের একজম লব্ধ-প্রতিষ্ঠ এবং ন্যায়নিষ্ঠ আইনজীবী। প্রধান বিচারপতি পীকক সাহেব তাঁকে

বিশেষ সম্মান করতেন, সমাদরও করতেন। ব্যবহারশাস্ত্রে ছিল তাঁর যথেষ্ট পাণ্ডিত্য; আর গণিত ও দর্শনশাস্ত্রে ছিল বিশেষ ব্যুৎপত্তি। তিনি ছিলেন বহুভাষাবিদ্। ইংরাজীতে তাঁর গভীর জ্ঞান তো ছিলই। অধিকন্তু ফরাসী, জার্ম্মান, স্পেনিশ, ও ইতালীয় ভাষা ভাল-ভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন, দর্শনশাস্ত্রের প্রতি অনুরাগবশতঃ তিনি ফরাসী দার্শনিক কোম্তের রচনাবলী মূল ফরাসী থেকেই সযত্নে পাঠ করেছিলেন। কিন্তু অর্থলালসা তাঁর ছিলনা এবং আইন-ব্যবসায়কে তিনি কেবলমাত্র অর্থোপার্জ্জনের উপায় হিসেবে গ্রহন করেন নি। সত্য ও ন্যায়ের পথে চলাই তাঁর জীবনের আদর্শ। এই আদর্শবাদ ও সাধুপ্রকৃতির জন্য সুখ্যাতি অর্জন করলেও অর্থার্জন তাঁর আশানুরূপ হয়নি। তিনি এতই সাধুপ্রকৃতির ছিলেন যে, কোন মক্কেলের মোকদ্দমার দায়িত্বগ্রহনের আগে সাতবার বিচার করে দেখতেন যে সেই মোকদ্দমা নিজের যোগ্য সম্মান রক্ষা করে চালাতে পারবেন কিনা। কোনরূপ অসাধুতা ও অসত্য তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। এমন প্রকৃতির ব্যবহারজীবীর ওকালতির পসার আর কতখানি জমতে পারে? তাই অর্থসম্পদ তিনি বিশেষ সঞ্চয় করতে পারেন নি। বিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাসে বিদ্বান ও উদারচেতা মহেন্দ্রলাল যৌবনেই ইহধাম থেকে অদৃশ্যলোকে বিদায় গ্রহন করেন।

পিতার অকাল মৃত্যুর পর বালক ব্রজেন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিবারের সকলে একরূপ অসহায় হয়ে পড়েন। অত্যল্পকালের মধ্যেই তাঁদের সবাইকে চরম আর্থিক অনটনে পড়তে হয় এবং শেষ পর্যন্ত বড় ভাইয়ের সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ মাতুলালয়ে চলে আসতে বাধ্য হন। তাঁদের মাতুলের অবস্থা যথেষ্ট স্বচ্ছল ছিলনা। সাত বছরের বালক ব্রজেন্দ্রনাথ বাল্যেই পিতৃবিয়োগের ব্যথা এবং দারিদ্র্যের

দুঃখ মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। দুই ভাইয়ের বাল্যকালের কাহিনী বড়ই করুণ ও মর্মস্পর্শী। কিন্তু এই নিবিড় দুঃখ যন্ত্রনাকে ব্রজেন্দ্রনাথ বরণ করে নিয়েছিলেন বিধাতার আশীর্বাদরূপে। কবির ভাষায় বলতে গেলে,

"দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল আলোক,
তবে তাই হোক।
মৃত্যু যদি কাছে আনে তোমার অমৃতময় লোক,
তবে তাই হোক॥
পূজার প্রদীপে তব জ্বলে যদি মম দীপ্ত শোক,
তবে তাই হোক।
অশ্রু আঁখি' পরে যদি ফুটে ওঠে তব স্নেহ চোখ,
তবে তাই হোক॥

দুঃখের আগুনেই হৃদয়ের আলোক জ্বলে। অন্তরের গুণাবলীর বিকাশে দুঃখের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এক তেজোময় উপকরণ। ব্যথিত আত্মার অভিজ্ঞতা মানুষকে পরম সম্পদ অন্বেষণের পথে প্রেরণা দেয়। জীবনে প্রেয় এবং শ্রেয় এই দুয়ের আকর্ষনের মধ্যে প্রেয়ের আহ্বান মানুষ দুঃখ না পেলে সহজে প্রত্যাখ্যান করতে পারেনা এবং শ্রেয়ের পথে তার অনুরাগ জন্মে না। বাল্যেই ব্রজেন্দ্রনাথ হৃদয়ের এই তীব্র দহণ জ্বালাকে বরণীয় মনে করেছিলেন শ্রেয়ের পথের পাথেয় হিসেবে।

অত্যাশ্চর্য মেধার স্বাক্ষর তিনি রেখেছিলেন বাল্য এবং কৈশোরেই ছাত্রাবস্থায়। একটি মাত্র অপূর্ব ঘটনার উল্লেখেও তার পরিচয় দেওয়া যায়। ব্রজেন্দ্র নাথ তখন সবে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। তখনকার দিনে উচ্চ ইংরেজী স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে (বর্ত্তমান সপ্তম-শ্রেণী) ছাত্রদের বীজ-গণিত ও জ্যামিতি পড়তে হত।

গ্রীষ্মাবকাশের পূর্বে বিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তকের সামান্য মাত্র পড়া হয়েছিল। সেবারে গ্রীষ্মের ছুটি পড়েছিল একমাস। কিশোর-ব্রজেন্দ্রনাথ স্থির করলেন তিনি ছুটিতে বীজগণিত ও জ্যামিতিটা পড়বেন ভাল করে। বীজগণিত ও জ্যামিতি এই বই দুখানি ছিল গোটা এনট্রান্স কোর্সের জন্য (অর্থাৎ সপ্তম থেকে দশম শ্রেণীর সমগ্র সিলেবাস্)। ব্রজেন্দ্রনাথ মাত্র একমাস ছুটির মধ্যেই সমগ্র বই দুখানি নিজেই আগাগোড়া আয়ত্ত করে ফেললেন। কি একাগ্র সাধনা ! বাৎসরিক পরীক্ষায় তিনি শীর্ষস্থান অধিকার তো সহজেই করলেন অপূর্ব কৃতিত্বের সঙ্গে। বিদ্যাভ্যাসে তাঁর প্রবল অনুরাগ দেখে সকলেই বিস্ময় বোধ করতেন। শিক্ষকদের তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র। এক বছর যেতে না যেতেই গণিত শাস্ত্রে তিনি এতদূর পারদর্শী হয়েছিলেন যে, ক্লাসের গণিত শিক্ষক যখন অনেক সময় দুরূহ প্রশ্নের সমাধান সহজে করতে না পারতেন, তখন তিনিই তার সমাধানে সাহায্য করে সকলকে চমৎকৃত করে দিতেন। গণিত শিক্ষক সে বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতে এম, এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। চতুর্থ শ্রেণীর একজন ছাত্র তাকে ক্লাসে অংক কষতে সাহায্য করে সত্যিই তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। এটা একটা অসাধারণ ব্যাপার নিশ্চয়ই।

এন্ট্রান্স (প্রবেশিকা) পরীক্ষা পর্যন্ত গণিত শাস্ত্রই ছিল ব্রজেন্দ্র নাথের সর্বাপেক্ষা প্রিয় বিষয়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্ব দেখালেন উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে বৃত্তি লাভ করে। তারপর ভর্ত্তি হলেন জেনারেল এসেম্ব্লীজ ইন্সটিটিউশনে। এই ইন্সটিটিউশন এখন স্কটিশ চার্চ কলেজ নামে অভিহিত। কলেজে অধ্যয়নের সময়ই অধ্যাপক হেস্টি সাহেবের প্রভাবে ব্রজেন্দ্র নাথের সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ অনুরাগ জন্মে। তিনি

যখন যে বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হতেন, তখন তা শেষ না করে ছাড়তেন না। তাই পাঠ্য তালিকার একে একে সমূহ বিষয়ই তিনি গভীর ভাবে পাঠ করে শেষ করেছিলেন। এক সময় যেরূপ গণিত-শাস্ত্র নিয়ে মত্ত হয়ে উঠেছিলেন, অন্য সময়েও সেরূপ সাহিত্য, দর্শন ইতিহাস, ব্যবহারশাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি একে একে অধ্যয়ন করে শেষ করলেন কলেজ জীবনে।

দুরূহ ও জটিল বিষয়ের প্রতি ব্রজেন্দ্রনাথের ভীতি তো কখনই ছিল না; বরং কঠিন ও জটিল বিষয় নিয়ে চর্চার মধ্যে ছিল তাঁর গভীর আনন্দ। কঠিন পুস্তক পাঠ করা ও তার বিষয়বস্তু অধিগত করার জন্য তিনি যে কোন পরিশ্রম করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। একবার প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে কলেজের অধ্যাপক হেস্টি সাহেবের কাছ থেকে তিনি একখানি লজিক (তর্কশাস্ত্র) বই পড়তে চেয়েছিলেন। সেটি ইংরেজীতে লেখা বিদেশী বই এবং খুব কঠিন; ঠিক ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তক বলে অধ্যাপকরা মনে করতেন না। কিন্তু প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর একটি ছাত্র যখন হেস্টি সাহেবকে বইখানি চাইল, তখন তার স্পর্ধায় তিনি বেশ বিরক্ত হলেন এবং এক চোট বকেও দিলেন। ব্রজেন্দ্র নাথ কিন্তু দমবার পাত্র নন। নাছোড়বান্দা হয়ে বইখানি দেবার জন্য তিনি সাহেবকে বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন। সাহেব শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বইখানি দিলেন। তিন চার-দিন পরে ব্রজেন্দ্র নাথ হেস্টি সাহেবের কাছে গেলেন বইখানি ফেরৎ দিতে। সাহেব তাকে দেখেই বলে উঠলেন, "কেমন, আমি তো বলেছিলাম, এ বইর তুমি কিছুই বুঝবে না। এটি খুব শক্ত বই।" সঙ্গে সঙ্গে ব্রজেন্দ্র নাথ উত্তর দিলেন, "না স্যার বইটা আমি ভাল করেই পড়েছি এবং বুঝেছি। বইটা খুব ভাল লেগেছে আমার।" একটি তরুণ কিশোরের কথায় অধ্যাপক-

সাহেব খুব আশ্চর্য হলেন। তিনি সহজে ব্রজেন্দ্রনাথের কথায় বিশ্বাস করলেন না। হাতের কাজ ফেলে ছাত্রটিকে নিয়ে পড়লেন। একের পর এক প্রশ্ন সুরু করলেন ছাত্র কতখানি পড়েছে তা দেখতে। কিন্তু অবাক কথা! মাত্র তিন দিন সেই শক্ত বইটি পড়ে ব্রজেন্দ্রনাথ অধ্যাপক হেস্টির সকল প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন সুন্দর ভাবে। শুধু উত্তর দেওয়া নয় শেষে বইখানির দোষ গুণও সমালোচনা করলেন। ধন্য ছাত্র! ধন্য শিক্ষক! হেস্টি সাহেবের প্রিয় হতে ছাত্রটির আর দেরী লাগল না।

কলেজে তিনি মোট পাঁচ বছর পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। অধ্যাপক হেস্টি সাহেব তাঁকে অত্যন্ত ভাল বাসতেন এবং নানা-বিষয়ে তাঁকে উৎসাহও দিতেন। এই হেস্টি সাহেবের কাছে স্বামী বিবেকানন্দ (তখন নরেন্দ্র নাথ দত্ত) পড়েছিলেন এবং তার ইংরাজী সাহিত্য পঠনে মুগ্ধ হয়ে জীবনের গতিপথের সন্ধান লাভ করেছিলেন। ঘটনাটি এরূপ। একদিন ক্লাসে অধ্যাপক হেস্টি-ইংরেজ-কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের "The Excursion" কবিতাটি ব্যাখ্যা সহ পড়াচ্ছিলেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এবং প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্তার ধ্যানে মগ্ন হয়ে কবি অনেক সময় আত্মবিস্মৃত হতেন এবং তাঁর বাহ্যজ্ঞান লোপ পেত। এরূপ ধ্যান-মগ্ন তন্ময় অবস্থা সাধারণতঃ লোকের আসে না; একালে সেরূপ মানুষের সাক্ষাৎ কদাচিৎ পাওয়া যায়। তবু অধ্যাপক বললেন এই বাংলায় তিনি এমন একজন লোককে প্রত্যক্ষ করেছেন, যিনি গভীর ধ্যানের মাঝে আপনার বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেন। আর সে মানুষটি হচ্ছেন দক্ষিণেশ্বরের কালী-সাধক রামকৃষ্ণ। সমাধিস্থ অবস্থা কাকে বলে, এটা ঠিক বলে বোঝান যায় না। তবে উৎসাহী ছাত্রেরা যদি সাধক রামকৃষ্ণকে দেখে আসে, তাহলে তারা কিছুটা উপলব্ধি করবে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকের

এই উক্তির পরই নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে রামকৃষ্ণকে দেখবার প্রবল আগ্রহ জন্মে। নরেন কয়েক বার সেই অলৌকিক সাধু পুরুষকে দেখে আসার পর সহাধ্যায়ী প্রিয়বন্ধু ব্রজেন্দ্রনাথকে আহ্বান করে নিয়ে যান দক্ষিণেশ্বরে। সেদিনের দক্ষিণেশ্বরের অভিজ্ঞতা উভয়ের জীবনকেই নাড়া দিয়েছিলে। এক অনির্বচনীয় ভাব যেন তাঁদের উভয়ের চিন্তারাশিকে ওলট পালট করে দিচ্ছিল। রামকৃষ্ণকে দেখে ফিরে আসার পথে প্রবল বৃষ্টি নামল। দুই বন্ধুতে ঝড় বাদলের মধ্যে ভিজে ভিজেই কলকাতা ফিরলেন। তখন দুই বন্ধুই ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত। নরেন্দ্রনাথ পরমহংস রামকৃষ্ণের প্রতি দৃঢ় ভাবে আকৃষ্ট হন্ এবং শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্ম সমাজ ত্যাগ করে রামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীলও হয়েও ব্রাহ্ম সমাজের মহর্ষি-দেবেন্দ্রনাথ, ঋষি রাজনারায়ণ ও ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্রের ন্যায়-ব্রাহ্ম নেতাগণের আদর্শে প্রভাবিত হয়ে ব্রহ্মবাদীই থেকে যান। রাজা রামমোহনকেই তিনি মনে করতেন তাঁর জীবনের আদর্শ মহাপুরুষ। বিখ্যাত বিপ্লবী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ও তাঁর সহপাঠী ছিলেন। স্যার আশুতোষও ছিলেন তাঁর সমসাময়িক।

যাই হোক, ছাত্র জীবনে বিবেকানন্দ নামা গুণে ভূষিত থাকলেও ব্রজেন্দ্রনাথের ন্যায় একনিষ্ঠ বিদ্যার্থী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেননি। ব্রজেন্দ্রনাথের অধ্যয়নের গভীরতা ও ব্যাপকতা কতদূর ছিল, তা অনেকের জানা নাই। ভাসা ভাসা জ্ঞানচর্চা তিনি পছন্দ করতেন না; যা পড়তেন, পড়তেন গভীর ভাবেই। ইংরাজী সাহিত্য অধ্যয়নকালে বর্ত্তমান যুগ থেকে আরম্ভ করে আদি যুগ পর্যন্ত যে সমস্ত লেখকের বই পাওয়া যায়, তার সব কিছুই পড়েছিলেন। এমন কি চসারের পূর্বেকার প্রাচীনতম সাহিত্য এবং ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের পল্লী গাথাগুলি পর্যন্ত তিনি বিশেষ

ভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। অসাধারণ প্রখর স্মৃতি-শক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। যা কিছু অধ্যয়ন করতেন, শুনতেন বা চর্চা করতেন, সবই তাঁর মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত হয়ে থাকত। তাঁর অদম্য জ্ঞানতৃষ্ণাও ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হতে থাকে অসংখ্য বিষয় অবলম্বন করে। তিনি যখন দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করলেন, তখন আধুনিক ও মধ্যযুগের ইউরোপের সমূহ দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের বইগুলি পড়ে শেষ না করে ছাড়লেন না।

এফ্. এ, এবং বি, এ, ক্লাসে মিশ্রিত পাঠ্য তালিকা ছিল। সেজন্য ছাত্রদের পক্ষে কোন বিশেষ বিষয় পাঠের বাধা ছিলনা এখনকার মত। দর্শন বিষয়ে তাঁর দক্ষতার সমধিক খ্যাতি থাকলেও বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞরাও তাঁর বিজ্ঞান অনুশীলনের দক্ষতায় বিমুগ্ধ হয়ে যেতেন। প্রকৃতপক্ষে এমন কোন বিষয় ছিল না, যাতে তাঁর অনুরাগের অভাব ছিল। পৃথিবীর কোন বিদ্যাই তাঁর অজ্ঞেয় ছিল না। আর বিভিন্ন বিষয়ের খুঁটিনাটিও থাকত নখদর্পনে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ব্রজেন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হন।

সসম্মানে এম. এ, পরীক্ষায় পাশ করবার পর আরম্ভ করলেন একের পর এক, অর্থশাস্ত্র, সংস্কৃত, হিন্দু দর্শন ও সাহিত্য; তারপর প্রাকৃত বিজ্ঞান ও পদার্থশাস্ত্র। তৎকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের জন্য বি, এস্-সি, বা এম্, এস্-সি, উপাধি দেওয়া হত না।

কর্মজীবনঃ

জ্ঞানানুশীলনই ছিল ব্রজেন্দ্রনাথের সারা জীবনের ব্রত। কর্মজীবনের প্রারম্ভেই তিনি কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষের পদে বৃত হন। দক্ষতার সঙ্গে সেখানে কয়েক বৎসর তিনি অধ্যাপনা করেন। তিনি ছিলেন অতিশয় নিয়মনিষ্ঠ। কর্ত্তব্যকর্মে কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করা ছিল তাঁর স্বভাবের একেবারে বাইরে। যে সব অধ্যাপক বা কর্মচারী তাঁর চোখে নিয়মনিষ্ঠা পালন করতেন না বলে বলে ধরা পড়তেন, তিনি তাঁদের যথেষ্ট তিরস্কার করতেন। অনিয়মনিষ্ঠ যে কোনও পরিচিত ব্যক্তির প্রতি তাঁর সারাজীবনই একটা বিরাগ ও ঘৃণা ছিল। শ্রমের মর্যাদা ছিল তাঁর কাছে অসীম। ছোটোখাট কোন কাজকেই তিনি অসম্মানজনক মনে করতেন না। প্রয়োজনীয় সকল খুঁটিনাটি কাজই তিনি নিজহাতে করতেন। এমন কি, ছেলেদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার আবেদনপত্রে অধ্যক্ষের যা কিছু লিখতে হয়, তা সবই তিনি নিজে লিখতেন; কেরাণীর হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকতেন না। সাধারনতঃ অন্যের দ্বারা লিখিত কোন জিনিষে স্বাক্ষর দিয়ে ছেড়ে দিতেন না।

ভিক্টোরিয়া কলেজের সুখ্যাতি তাঁকে টেনে আনল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে তিনি কোচবিহার পরিত্যাগ করে আসেন এবং এখানে দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের পদ অলংকৃত করেন। এখান থেকেই তাঁর যশঃসৌরভ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর অধ্যাপনার সঙ্গে অধ্যয়নের নিরলস উদ্যোগ চিরকালই ছিল। কলকাতায় থাকা কালেই তিনি

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাশিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। ইংরাজী এবং বাংলা ছাড়া গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসী, জার্মাণ, ইতালীয়, আরবী, পারসী ও সংস্কৃত তিনি বিশেষ ভালভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন এবং প্রত্যেকটি ভাষাতেই লেখবার ক্ষমতা তাঁর ছিল। এ ছাড়া ভারতের ৯।১০টি প্রাদেশিক ভাষাও তাঁর সুন্দরভাবে জানা ছিল।

ব্রজেন্দ্রনাথ বাহ্যজ্ঞানহীন দার্শনিক বলে সমধিক পরিচিত হলেও কর্মশক্তির অভাবও তাঁর ছিল না। এই কর্মশক্তির প্রাচুর্যই তাঁকে বারে বারে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের মধ্যে টেনে নিয়ে গেছল। আর সেটা ছিল তাঁর কাছে বিধাতার নির্দেশ বা ইচ্ছা। মহীশূরের রাজার আহ্বানে তিনি বাংলামায়ের কোল ছেড়ে সুদূর দাক্ষিণাত্যে যান। প্রথমে তিনি গ্রহণ করেন মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ এবং তৎপরেই বৃত হন উপাচার্যের (ভাইস্-চ্যান্সেলারের) বিরাট দায়িত্বপূর্ণ আসনে। বাংলার বাহিরে অনেক বাঙ্গালীই তাঁদের কৃতিত্বের অমর স্বাক্ষর রেখে বাংলামায়ের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। ভারতের নব জাগরণে বাঙালীর দান অপরিমেয়, তাদের মধ্যে কেউ শিল্পী, কেউ সাহিত্যিক, কেউ বা রাজনীতিবিদ, আর কেউ বা ছিলেন সরকারী চাকুরীয়া। উকিল, মোক্তার ডাক্তারেরও অভাব তাদের মধ্যে ছিলনা। আবার শিক্ষা ও সমাজসংস্কারে, ধর্মআন্দোলনে এবং স্বরাজ সাধনায় সবল নেতৃত্ব নিয়েছেন অনেকে। চিন্তাজগতে বাঙ্গালী সব দিকেই ছিল অগ্রণী। "আজকের বাঙ্গালী যা চিন্তা করে, সারা ভারত পরদিন তাই নিয়ে ভাবে,"—(একটা) প্রবাদ বাক্যের মতই উচ্চারিত হয়েছে প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে। বাঙ্গালী শুধু বাংলামায়ের কেন, বিশ্বের কাছে ভারতমাতার মুখোজ্জ্বল করে-

বাংলামায়ের কেন, বিশ্বের কাছে ভারতমাতার মুখোজ্জ্বল করেছেন। এই অবদানের ক্ষেত্রে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের দানও চিরকাল স্মরণ করবার মতো। একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য যে অক্লান্ত শ্রমশক্তি দরকার, যে মনীষা, দূরদর্শিতা ও দৃঢ়তার প্রয়োজন, তা আচার্যের ছিল। তাঁর অসাধারণ কর্মকুশলতায় তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়টিকে সুউচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন, এটা সামান্য কথা নয়, বিশেষ করে সেই বিদেশী শাসনের আমলে। স্যার আশুতোষ যেমনএকদা কলকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণস্বরূপ ছিলেন, আচার্য স্যার ব্রজেন্দ্রনাথও সেইরূপ মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণস্বরূপ ছিলেন একই কালে শিক্ষা জগতের এই দুই মহাধুরন্ধর ভারতের দুই প্রান্তপ্রদেশকে প্রদীপ্ত করেরেখে ছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ প্রানভরেই ভালবাসতেন মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়কে। তাঁর দীর্ঘকালের সার্থক সাধনায় সবিশেষ সন্তুষ্ট হয়ে মহীশূরের মহারাজা শেষে তাঁকে তাঁর রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর পদে বৃত করেন। এখনকার গনতন্ত্রের কাঠামোয় সংখ্যাধিক্যের ভোটের জোরে মন্ত্রী হওয়া, আর প্রকৃত যোগ্যতা অর্জন করে উচ্চ রাজপদে সমাসীন হওয়ার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। এ যুগে পদের প্রতি প্রলুব্ধ আকর্ষন প্রবলরূপেই প্রসারিত হয়েছে, কিন্তু সমান্তরালভাবে যোগ্যতা অর্জনের যথেষ্ট যত্ন ও জাগ্রৎদৃষ্টি বর্ধিত হয়নি। তাই একালের দৃষ্টি দিয়ে সেকালের সাধনাকে বিচার করার বিপদ আছে।

জ্ঞান-সাধনাঃ

'সর্ববিদ্যা-বিশারদ' বলে একটি বিশেষণ আমাদের কাছে পরিচিত এবং এই বিশেষণটি আমরা অনেক সময় নির্বিচারে প্রয়োগ করে থাকি। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে প্রশ্ন জাগবে, সত্যিই কি সকল বিদ্যায় পারদর্শী কোন মানুষ থাকতে পারেন ? এমন প্রতিভা কি কখনো জন্মায়, যে প্রতিভা এই জগতের পূর্ব-অনুশীলিত সমূহ বিষয়ের প্রতি সমভাবে আকৃষ্ট হতে পারে এবং সমভাবেই সেগুলিতে পারদর্শিতা অর্জন করতে পারে ? প্রকৃত অর্থে সর্ববিদ্যা-বিশারদের সংখ্যা সারা জগতে নিশ্চিতরূপেই নগণ্য। কিন্তু যে অল্পসংখ্যক মহাপণ্ডিতও তাঁদের অতুলনীয় প্রতিভার আশ্চর্যরূপ বিকাশের জন্য "সর্ববিদ্যাবিশারদ" আখ্যা পাবার যোগ্য, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আর এই অভিমত প্রকাশ করেছেন দেশবিদেশের শত শত মহাপণ্ডিত ও প্রতিভা-শালী পুরুষ। পৃথিবীর কোনও জ্ঞানের বিষয়কে ব্রজেন্দ্রনাথ দুরূহ বলে ছেড়ে দেননি। যত জটিল ও যত কঠিনই হোক না কোন বিষয়, তাকে অধিগত করার মধ্যেই ছিল তার অসীম আনন্দ। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যাঁদের পরিচয় ছিল, তাঁরা জানতেন এবং প্রচারও করেছেন, কি সুগভীর মনোযোগ ও নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি অধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকতেন। এটা ছিল সত্যিই তাঁর তপস্যা, তাঁর যোগসাধনা। সংসারের শত কোলাহলও তাঁর তপস্যাকে ভাঙ্গতে পারত না। জ্ঞানরাজ্যে ধ্যানগম্ভীর বিরাট হিমগিরির মতই মনে হতো তাঁকে জ্ঞানরাজ্যে। যখনই তিনি কোন বিষয়ের চর্চা করতে বসতেন, তাঁর একাগ্র মননশীলতার আলোকে তখনই সেই বিষয়ের

গ্রন্থগুলির দোষগুণ ত্রুটিবিচ্যুতি সহজেই তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠত, সাহায্যকারী কোন টীকা-ভাষ্যাদির দরকার হতো না। এমন তন্ময়তা, এমন তদগতচিত্ততা খুব কম মনীষীর মাঝেই দেখা গেছে। এমন অনেক দিন কেটেছে, যখন হয়তো তিনি সন্ধ্যাবেলা অধ্যয়নে বসেছেন এবং আহার-নিদ্রার কথা ভুলে গেছেন; আর যখন পড়া শেষ করে উঠলেন তখন পরদিন বেলা দুপুর। আজকের দিনে আর এরূপ তপস্বী দেখা যায় না। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্রও কতক পরিমানে এই প্রকৃতির ছিলন। কিন্তু তিনি ছিলেন শুধুমাত্র বিজ্ঞান জগতের লোক। প্রসংগতঃ বলা যায়, তাঁর সংগেও ব্রজেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা ছিল। যাই হোক, বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি তাঁর বিচিত্র অনুরাগের একটা সামান্য পরিচয় এখানে দেওয়া যাচ্ছে। এক ভদ্রলোক একবার বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ বসবার পরে তাঁকে আচার্যের নিজের ঘরে ডেকে পাঠান হল। ভদ্রলোক ঘরে ঢুকেই তো অবাক! বিপুল গ্রন্থ-রাজির মধ্যে বসে ব্রজেন্দ্রনাথ নিমগ্ন চিত্তে কিছু যেন অধ্যয়ন কর-ছেন। চারদিকে অনেকগুলি ম্যাপ ও চার্ট ছড়ান। সবিনয়ে ভদ্রলোক জিগ্যেস করলেন, "কিছু পড়ছিলেন আপনি? মার্জনা করবেন, বিরক্ত করলাম আপনাকে।" আচার্য উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, দেখছিলাম দক্ষিণ আমেরিকার ভূপ্রকৃতি"। তিনি যে কেবলমাত্র শীর্ষস্থানীয় দার্শনিক ছিলেন না, একথা বলা বাহুল্য। তবে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, গণিত ও ভাষাতত্ত্ব ছাড়িয়ে তিনি যে আমেরিকার ভূপ্রকৃতির পুংখানুপুংখ বৃত্তান্ত অধ্যয়ন করতে পরিনত বয়সেও পরাংমুখ হননি, সত্যিই এ এক বিস্ময়! ধন্য জ্ঞানযোগী!

বিজ্ঞান অনুশীলনে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের মৌলিকত্ব বিজ্ঞানী তথা সমগ্র সুধীসমাজ কর্তৃক স্বীকৃত। তাঁকে যে পি, এইচ, ডি ডিগ্রী দেওয়া হয়েছিল, তা ছিল তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক গবেষনা গ্রন্থ "দি পজিটিভ সায়েন্স অব দি অ্যানসেণ্ট হিন্দুজ" (The Positive Science of the Ancient Hindus) এর উপর ভিত্তি করে। অনবদ্য ভাষা ও অননুকরণীয় ভঙ্গীতে এই গ্রন্থ লিখিত। অবশ্য পুস্তকখানি তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের কিছুকাল পরে প্রকাশিত হলে সকলকে চমৎকৃত করে। তাঁর বিজ্ঞান-চেতনা কতখানি মৌলিক ছিল এবং অনুসন্ধানস্পৃহাও কত প্রবল ও কার্যকরী ছিল, এই পুস্তক থেকেই সকলে তার পরিচয় পায়। এর মধ্যে বিষয়বস্তুর প্রামাণ্য নিয়ে যাতে পাঠকের মনে কোন সন্দেহ না জন্মে, সেজন্য তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভেই দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন, "আমি এমন এক ছত্রও লিখিনি যা অতি পরিস্ফুট নজিরের দ্বারা সমর্থিত নয়।" যে অতীত যুগের বিজ্ঞান-সাধনা সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা, প্রকৃতপক্ষে সেই কালটি হলো খৃষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দ থেকে খৃষ্টাব্দ ৫০০ পর্যন্ত এই দীর্ঘ হাজার বছর। তাঁর আলোচ্য জড়বাদী বিজ্ঞান আলোচনা নেতিবাচক দর্শন বা অধ্যাত্মবাদের বিপরীতধর্মী। তিনি যদি শুধু শুষ্ক দার্শনিক হতেন, তাহলে বস্তুবাদী বিজ্ঞানের গবেষনা তাঁর দ্বারা সম্ভব হতো না। তাঁর গ্রন্থের মধ্যে হিন্দু-বিজ্ঞানের এরূপ বিভিন্ন শাখার উপর আলোচনা আছে, যেমন,—পরমানুতত্ব জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান ইত্যাদি। নানারূপ চমকপ্রদ বিবরণ এতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এ যুগের বিজ্ঞান যেমন নিত্যনূতন বিস্ময় সৃষ্টি করেছে, হিন্দুরাও তেমনি দুহাজার বছর আগেও বিজ্ঞানে তাদের প্রতিভা দেখিয়েছিল। আজ আমরা যখন শুনি যে সময়ের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিমাপ করতে

করতে বিজ্ঞানীরা এক সেকেণ্ডের কয়েক হাজার বা লক্ষ ভাগও পরিমাপ করতে পারেন বলে দাবী করেছেন, তখন তা শুনে আশ্চর্যান্বিত হই। কিন্তু প্রাচীন হিন্দুদের কাছে যে এক সেকেণ্ডের চৌত্রিশ হাজার ভাগ পরিমাপ করবার পদ্ধতি সুবিদিত ছিল, তা জেনে কোন ভারতবাসীর না গর্বে বুক ফুলে ওঠে? আচার্য জগদীশ-চন্দ্র বসু যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সাহায্যে প্রমাণ করেছেন, উদ্ভিদের প্রাণ আছে এবং অন্য যে কোন প্রাণীর ন্যায় উদ্ভিদ্ সুখ দুঃখ হাসি কান্নায় সাড়া দেয়, সে তত্ত্ব প্রাচীন হিন্দুদের নিকট অবিদিত ছিলনা। ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর উল্লিখিত পুস্তকেই পাঠক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন যে, মহাভারতের শান্তিপর্বের ১৮৪তম অধ্যায়ের শ্লোকগুচ্ছের মধ্যে উদ্ভিদের প্রাণশক্তির কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণিত আছে।

রসায়ন বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় যে "হিষ্ট্রি অব্ হিন্দু কেমেষ্ট্রি" গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন, সেই বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায়ও ব্রজেন্দ্রনাথের মৌলিক অবদান বর্ত্তমান। শুধু যে প্রাচীন বিজ্ঞান চর্চার অনুসন্ধান করে ক্ষান্ত ছিলেন তা নয়, বর্ত্তমান জগতে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির প্রতিও তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়ও তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল যে কোনও বিজ্ঞান-শিক্ষকের মতোই। ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় যে 'হিষ্ট্রি অব্ ইণ্ডিয়ান শিপিং' (History of Indian Shipping —ভারতীয় অর্ণবপোতে ব্যবসার ইতিহাস) রচনা করেছিলেন, সে গ্রন্থের উপাদেয় ভূমিকাটি লিখে দিয়েছিলেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ।

বিশ্বসভায় ব্রজেন্দ্রনাথ

১৯১১ সালে লণ্ডনে এক বিরাট 'বিশ্বজাতি সম্মেলন' (*Universal Race Congress*) অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের চিকাগোর বিশ্বধর্ম সম্মেলন (World's Parliament of Religions) থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিলনা। স্বামী বিবেকানন্দের পরে বিশ্বসভায় আবার যে বাঙ্গালী বীর ভারতের প্রতি সারা পৃথিবীর সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট করলেন, তিনি এই আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ। এই ভারতরত্ন আচার্যের উপরই সেদিন বিশ্বজাতি সমাবেশে দায়িত্বপূর্ণ সমূহ কার্যাবলীর উদ্বোধনের ভার অর্পিত হয়েছিল এবং সে দায়িত্ব তিনি যোগ্যতার সঙ্গে পালন করে বিশ্ববাসীর ধন্যবাদ অর্জন করেছিলেন। সম্মেলনে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির সুযোগ্য প্রতিনিধিরা সমবেত হয়েছিলেন। তাঁদের সামনে প্রসঙ্গতঃ বিজ্ঞানের জয়যাত্রাকে মানবকল্যানের দিকে ফিরাবার সম্বন্ধে তিনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি মন্তব্য করেছিলেন বলিষ্ঠ ভাষায়,—

"Modern science, first dirccted to the Conquest of Nature, Must now be increasingly applied to the organisation of Society."

অর্থাৎ, আধুনিক বিজ্ঞান প্রথমতঃ প্রকৃতি বিষয়কে লক্ষ্য করে প্রযুক্ত হলেও এখন তার ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ করতে হবে সমাজ সংগঠনের কাজে।'

অবশ্য এই বিশ্বজাতি সম্মেলনের পূর্বেও ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে রোমে যে *International Orientalist Conference* বা 'আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ সম্মেলন' আহূত হয়, তাতে ব্রজেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। বিবেকানন্দের সুযোগ্য বন্ধু ও সহাধ্যায়ী ব্রজেন্দ্রনাথ সেদিনও তাঁর উপযুক্ত সম্মান পেয়েছিলেন। বিবেকানন্দ-শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকবার সুযোগ পেয়েছিলেন, যদিও স্বামিজী তখন অন্যত্র। স্বামিজী এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকলে যে তাঁর সহপাঠী বাল্যবন্ধুর নিজতুল্য কৃতিত্বে উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন এবং পরে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রকে প্যারী সম্মেলনে দেখে ভারতবাসী হিসেবে যেরূপ গর্ব অনুভব করেছিলেন, সেরূপ গর্বে যে তাঁর বুক ফুলে উঠত, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। ব্রজেন্দ্রনাথ সম্মেলনে কয়েকটি বিষয়েই মনোজ্ঞ আলোচনা করে সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ আলোচ্য বিষয় ছিল বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের তুলনামূলক পাঠ (*Comparative study of Vaishnavism and christianity*)। শিকাগো ও রোমে ছিল ধর্ম্মতত্ত্ব বা দর্শনের আলোচনার সুযোগ, যা পরবর্ত্তী লণ্ডনের বিশ্বজাতি সম্মেলনে ছিলনা। গত শতাব্দীর শেষ দশকে শিকাগো ও রোম নগরীর সম্মেলন দুটি দুই বাঙ্গালী তরুণের প্রতিভা দ্বারা আশ্চর্যভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। শিকাগোতে আমেরিকাবাসী তথা অন্যান্য ধর্ম্মের প্রতিনিধিরা স্বামিজীর মুখে শুনলেন মূলতঃ হিন্দুধর্ম্মের অদ্বৈত বেদান্ত বা শাংকর বেদান্তের কথা, আর তার ছ' বছর পরে (তখন ব্রজেন্দ্রনাথের বয়স মাত্র ৩৫ বছর) রোমের প্রাচ্য দেশীয় কংগ্রেস ব্রজেন্দ্রনাথের কাছে শুনল হিন্দুর, বিশেষ করে বাঙ্গালীর বৈষ্ণব ধর্ম্মের কথা। রোম সম্মেলনে

'ভারতীয় শাখা'র উদ্বোধন করেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথই। প্রথমে তিনি পাঠ করেছিলেন "সত্যের পরীক্ষা" (*The Test of Truth*) এই বিষয়ে নিয়ে এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ। তারপর এতে আরও একটি গবেষণামূলক সন্দর্ভ শোনালেন সকলের সামনে, "আইনের উৎপত্তি এবং সমাজ বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে হিন্দুজাতি" ***(Origin of Law and Hindus as Founders of Social Science)***

প্রাচ্য কংগ্রেসে তাঁর **বৈষ্ণবধর্ম্মের রসতত্ত্ব** ব্যাখ্যা অপূর্ব। বৈষ্ণব ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই শাখা, একথা বলা বাহুল্য। পুরাণোক্ত বৈষ্ণব ধর্ম্ম এবং শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্ম মিশ্রিত হয়ে বাঙ্গালীর কাছে একটা নূতন রূপ নিয়েছে। বাঙ্গালী হিন্দু উপলব্ধি করেছে যুগল-প্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। প্রাচ্য দেশীয় পণ্ডিত মণ্ডলী ব্রজেন্দ্র-নাথের মুখে বাঙ্গালী বৈষ্ণবের রসতত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে গেলেন। আগে খৃষ্টান পণ্ডিতদের একটা মতবাদ ছিল যে যীশুখ্রীষ্ট প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্ম থেকেই হিন্দুর বৈষ্ণব ধর্ম্মের উদ্ভব। 'যদি তোমার এক গালে কেউ চড় মারে, তাহলে তুমি অন্য গাল পেতে দাও,'—প্রেম দিয়ে অন্যের হৃদয় জয় কর,—এই প্রেমমন্ত্র যীশুখ্রীষ্টের। শ্রীচৈতন্য জগাই মাধাইকে বলেছিলেন, মেরেছ কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দিব না?' কিন্তু প্রশ্ন ছিল, বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাচীনত্ব কতখানি? বৈষ্ণব ধর্ম্ম কি যীশুখ্রীষ্টের পরে প্রবর্ত্তিত হয়েছে? ব্রজেন্দ্রনাথ প্রমাণ করলেন,—

(১) হিন্দুর প্রামাণ্য শাস্ত্র উপনিষদ থেকেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিকাশ।

(২) বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনেক পরিণত অবস্থায় মাদ্রাজ উপকূলে

খৃষ্টান ধর্ম্মের সঙ্গে এর সাক্ষাৎ ঘটে। ভারতের পশ্চিম উপকূলে তখন খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারিত হয়েছিল। এই সাক্ষাৎ ও সংঘাতের ফলে এক ধর্ম্মের লোকে অন্যধর্ম্মের কাছ থেকে ভাব ধারা ও রস গ্রহণ করে; ফলে দুই ধর্ম্মেরই মতবাদ পরিপুষ্ট হবার সুযোগ পায়।

(৩) বাংলার ছেলে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন বা তাঁর নিজ জীবনে যা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেন, তা কেবল শাস্ত্রকথিত প্রেমবাদ নয়, তা হল সূক্ষ্ম ও অপরোক্ষ রসানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার অন্তর্নিহিত গূঢ় তত্ত্ব ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ব্যাখ্যাত এবং অনেকটা অভিনব। এ দিক দিয়ে শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব হয়েও অনেকখানি মৌলিক ভাবধারার স্রষ্টা বলা যেতে পারে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে বিংশ শতাব্দীর দিকে তাকিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বাঙ্গালী বৈষ্ণবের প্রেমধর্ম্মকে জগতের সামনে তুলে ধরলেন তাঁর সাধনা ও জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করে।

এরপর লণ্ডনের **"বিশ্বজাতি সম্মেলনে"** (১৯১১) তিনি তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্যে পাশ্চাত্ত্য জগৎকে মুগ্ধ করেন। প্রায় একশত বছর আগে নবযুগের অগ্রদূত রাজা রামমোহনের কণ্ঠে যেরূপ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলন-গাথা উদ্গীত হয়েছিল, আজ আবার তাঁরই ভাবশিষ্য ব্রজেন্দ্রনাথও প্রাচ্য-প্রতীচীর মিলন-মহোৎসবের মালা গাঁথলেন।

জাতীয় আন্দোলনে ব্রজেন্দ্রনাথ ঃ—

ব্যক্তিগতভাবে ব্রজেন্দ্রনাথ বাংলার বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেন নি, বা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করেন নি, কিন্তু তিনি বিপ্লবের মন্ত্রগুরুদের একজন এবং ভারতের নূতন জাতীয়তা-বাদের আদিযুগের অন্যতম পুরোহিত। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্ব্ব থেকেই বিপ্লবের মেঘ বাংলার তথা ভারতের ভাগ্যাকাশে ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, **'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।'**.........বলেছিলেন, 'আগামী পঞ্চাশৎ বৎসর ধরিয়া দেশ জননীই তোমাদের একমাত্র আরাধ্যা দেবী হউন। বলেছিলেন 'ইউরোপীয় সভ্যতা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের উপর অবস্থিত, অবিলম্বে ধ্বংস হয়ে যাবে যদি আধ্যাত্মিকতাকে না আশ্রয় করে।' ঠিক একই সময়ে আচর্য ব্রজেন্দ্রনাথ ও রোমের সভায় (১৮৯৯) উচ্চারণ করলেন,—

"সংস্কৃত সাহিত্যের আবিষ্কারের পর থেকেই আরম্ভ হয়েছে ইউরোপের নবজন্ম। গ্রীস এই নবজন্ম বা রেনাইসেন্সের প্রেরণা যোগাতে পারবে না। সারা ইউরোপে আজ ভয়ংকর লোভ ও সংঘাত, উন্মাদের ক্ষুধা এবং জঘন্য ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতা, বর্বরতা এবং আত্মঘাতী সাময়িক সাজসজ্জা দেখা যাচ্ছে। গ্রীক দর্শন ও গ্রীক সংস্কৃতি এ রোগের আর ওষুধ দিতে পারবে না। ইউরোপের দর্শন ও জীবন সাধনার মধ্যে নূতন রক্ত সঞ্চার করতে পারে একমাত্র হিন্দুর অধ্যাত্ম-সাধন ও পরাবিদ্যা।" [তাঁর নিজের ভাষায়,—

The prepartion for the greater European Renaissance, of which I speak, began with what has been called the discovery of Sanskrit. ....A New European Renaissance, if it is to come, must not therefore look to Greece for inspiration.....(In every country of Europe we see) fierce greeds and contentions, its mad hunger and coarse sensualism, its gross barbarianism and destructive militarism. ....Greek Philosophy, Greek culture, has no cure for this malady. ....***The speculative ardour, the metaphysical genius, the science of the Absolute, of the Hindus, are exactly fitted to infuse a new blood into European Philosophy, and to arouse its dormant activity.***]

বিবেকানন্দের সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথের ভাব ও ভাষার সাদৃশ্য আশ্চর্য রকমের। স্বামিজীর ভাষায়,—

"হিন্দু ও গ্রীক এ যুগে পূর্ব্বোক্ত জাতিদ্বয়ই অন্তর্হিত হইয়াছেন, কেবল তাঁহাদের শারীরিক বা মানসিক বংশধরেরা বর্ত্তমান। ইউরোপ, আমেরিকা যবন (গ্রীক)-দিগের সমুন্নত মুখোজ্জলকারী সন্তান; আধুনিক ভারতবাসী আর্যকুলের গৌরব নহে। কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এই আধুনিক ভারতবাসীতেও অন্তর্নিহিত পৈতৃক শক্তি বিদ্যমান। যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় তাহার পুনঃস্ফুরণ হইবে।....সমগ্র ইউরোপ আজ সর্ব বিষয়ে প্রাচীন গ্রীসের ছাত্র এবং উত্তরাধিকারী।

আধুনিক সময়ে পুনর্বার এই দুই মহাশক্তির সম্মিলন-কাল

উপস্থিত। **এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ**। (— 'ভাববার কথা')

মহাশক্তির কৃপায় ভারতবর্ষ জাগবে, জাগবে ইউরোপকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য, — পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য। মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দও এই সত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গেও আচার্য এবং স্বামিজীর ভাব-সাদৃশ্য বিশেষ ভাবে অনুধাবনযোগ্য।

বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা ও ব্রাহ্ম-ধর্মের প্রচারক বিপিন চন্দ্র পাল জাতীয় আন্দোলনে প্রথম যোগ দেন ১৯০১ সালে বিলাত ও আমেরিকা ভ্রমন সেরে ফিরে আসার পর। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার (১৮৮৫) পর থেকেই ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদনের পালা চলছিল। এই শতকের গোড়ার দিকে এই আবেদন-নিবেদনের মনোভাব নিয়ে আন্দোলন করতে কোন কোন জাতীয়বাদী নেতা অস্বীকার করেন। প্রথমে ভারতের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য যে চেষ্টা চলছিল, তা নিয়ে তাঁরা আর আন্দোলন না করে একেবারে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী তোলেন। এঁদের মধ্যে মহামতি বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, লালা লাজপৎ রায়, চিত্তরঞ্জন, শ্রীঅরবিন্দ্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতাও যোগ দিয়েছিলেন। বিপিন চন্দ্র পাল বিদেশ থেকে ফিরে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচারে ততখানি মনোযোগ না দিয়ে জাতীয়বাদ প্রচারে বিশেষ উদ্যোগী হলেন। জাতীয় নেতারা তখন নরমপন্থী ও চরমপন্থী ***(Moderates and Extremists)*** এই দুইটি দলে বিভক্ত হয়েছিলেন। বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন নরমপন্থীদের দলে। জাতীয়তাবাদ প্রচারের জন্য বিপিনচন্দ্র প্রথমেই "দি নিউ ইণ্ডিয়া" ***(The New India)*** নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচার করে তাতে চরম-

পন্থীদের মনোভাব ব্যক্ত করতে থাকলেন। অরবিন্দ তখনও বাংলায় আসেনি এবং গুপ্ত সমিতির কাজও আরম্ভ হয়নি। ভগিনী নিবেদিতাও এই নিউ ইণ্ডিয়া পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন। এবং তিনি তাঁর (*Web of Indian life*) গ্রন্থখানি এতে ক্রমশঃ প্রকাশ করতে থাকেন। নিউ ইণ্ডিয়া'তে যে নূতন জাতীয়বাদের আদর্শ প্রচারিত হয়, তার ভিত্তি ছিল আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ব্যাখ্যাত ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদর্শ। আচার্য শীল তাঁর বক্তব্য এক অতি উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন জাতি হিসেবে ভারত হবে আত্মশক্তিতে নির্ভরশীল এবং সকল প্রকার দাস-সুলভ মনোভাব বর্জ্জিত। ভারতের যে যুগ যুগ সঞ্চিত মহান ঐতিহ্য আছে, সত্য, প্রেম ও পরামুক্তির যে সাধনা আছে, তাই হবে আমাদের জাতীয়তাবাদের আশ্রয়-স্থল। তিনি তাঁর নিজের লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধেও এ ভাব ব্যক্ত করেছেন যে রাষ্ট্র-বিষয়ক ব্যাপারে ভারতে ধর্মের স্থান সর্ব্বাগ্রগণ্য। এখানে রাজা বা শাসক বরাবর ধর্ম্মকেই মানিয়ে চলেছিলেন। আর এখনও তাই করতে হবে। এটি হল স্বামিজীরও অভিমত। স্বামিজী বলেছিলেন, "আমি দৃঢ়ভাবে বলিতেছি, হিন্দু সমাজের উন্নতির জন্য ধর্ম্মকে নষ্ট করিবার কোন প্রয়োজন নাই এবং ধর্ম্মের জন্যই যে সমাজের এই অবস্থা তাহা নহে; বরং ধর্ম্মকে সামাজিক ব্যাপারে যেভাবে কাজে লাগানো উচিত, তাহা হয় নাই বলিয়াই সমাজের এই অবস্থা।" সুতরাং ভারতের জাতীয়তাবাদ ধর্ম্মবর্জিত হবে না, এই হল স্পষ্ট কথা।

বিপিনচন্দ্র বিলাত যাবার (১৮৯৮) আগেই ব্রজেন্দ্রনাথের কাছে বাঙ্গালীর নূতন জাতীয়তাবোধের স্বরূপ বুঝতে সুরু করেছিলেন। তিনি যে দার্শনিক ভিত্তির উপর জাতীয়তাবোধের

আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা মূলতঃ ব্রজেন্দ্রনাথের প্রেরণা ও উদ্দীপনার ফল। স্বামিজীর গুণগ্রাহী বন্ধু ব্রজেন্দ্রনাথ ভাবজগতে যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল ছিলেন, তার পরিচয় নানাভাবেই আমরা পাই। স্বামিজীর দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয়েও ব্রজেন্দ্রনাথ নব জাতীয়তাবোধের অন্যতম স্রষ্টা। তাঁর ভাবাদর্শ বিপিনচন্দ্র পালের মধ্য দিয়েই অনেকখানি সঞ্চারিত হয়েছে জাতীয় আন্দোলনের নেতা ও অনুগামীদের মধ্যে। নিউ ইণ্ডিয়ার রচনাবলীর জন্য ব্রজেন্দ্রনাথের পরামর্শ ছিল অপরিহার্য। প্রায় দীর্ঘ ছ' বছর ধরে নিউ ইণ্ডিয়া বাংলার তথা ভারতের স্বদেশসেবকদের কানে জাতীয়তার নূতন মন্ত্র জুগিয়েছিল। বিখ্যাত বিপ্লবী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ও এই জাতীয়তাবাদের একজন ধারক ও বাহক ছিলেন।

আবার, ব্রজেন্দ্রনাথ রোমে যে বৈষ্ণব রসতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে প্রেমের ধর্ম্মকে বাঙ্গালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলে প্রতিপন্ন করলেন, সেই বৈষ্ণব ভাব বিপিনচন্দ্রের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল এবং বিপিনচন্দ্রের কাছ থেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনও এই ভাবে ভাবিত হয়েছিলেন। ১৯১৪ সালে দেশবন্ধু "নারায়ণ" নামে যে মাসিক পত্র বার করেন, তাতে তিনি ব্রজেদ্রনাথের লেখা সংগ্রহ করে প্রকাশ করতেন। কিন্তু একই বৈষ্ণব ভাবের বীজ তিনটি ভিন্ন প্রকৃতির ক্ষেত্রে প্রক্ষিপ্ত হয়ে ভিন্ন আকার পরিগ্রহ করেছিল। আর সেটাই স্বাভাবিক। কারণ, অধিকারী ভেদে বা প্রকৃতিভেদে একই ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন আকার নিয়ে থাকে।

যাই হোক, একথা সত্য যে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ ঋষি রাজনারায়ণের মতো ভারতীয় ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির উপর ভারতের জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে স্বামিজীর ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার বিশেষ সাদৃশ্য ছিল। আর এঁদের সকলেরই উৎস ছিল ভারত-পথিক রাজা রামমোহন রায়।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে ঃ

সর্বধর্ম-সমন্বয়ের মূর্তপ্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকী প্রতিপালিত হয় সারাবিশ্বে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে। পর বছরই এই উপলক্ষে মহানগরী কলকাতায় এক বিশ্বধর্ম-সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ভারতের সুযোগ্য প্রতিনিধি হিসেবে ব্রজেন্দ্রনাথকেই এই ধর্মমহাসভায় পৌরোহিত্যের জন্য মনোনীত করা হয়। নিরভিমান ও নিরহংকার এই আচার্য সেদিন মানসম্মানের প্রতি দৃক্‌পাত না করে মহাসভার উদ্যোগকে পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের অপূর্ব সুযোগ বলে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করেছেন রামকৃষ্ণের ধর্মোপদেশদানের অপূর্ব সরল ভঙ্গিমা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। রামকৃষ্ণ যেভাবে নানারূপ রূপক, উপমা ও সহজ সরল গল্পের মাধ্যমে শ্রোতার মনকে আকৃষ্ট করতেন, বোধ হয় যীশুখৃষ্ট ছাড়া জগতে আর কোন ধর্মগুরুর মাঝে ঠিক এতোখানি দেখা যায়নি। রামকৃষ্ণ যেন ছিলেন অফুরন্ত জ্ঞান ও কথামালার ভাণ্ডার। খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্নধর্মের মূল সত্যের উপলব্ধি যে তিনি নিজ সাধনার মধ্যে করেছিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন, “যত মত, তত পথ,” এটা বিশ্বের জনসাধারণের অনুধ্যানের বিষয়। আমরা কেবল জাতীয়তাবাদের দ্বারা দেশের অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে চাই, কিন্তু তার ভিত্তি যদি আধ্যাত্মিকতা না হয়, তাহলে দেশপ্রেম বা জাতিপ্রেম মানবসভ্যতাকে অধিক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের উর্ধে থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বপ্রেমেরই আদর্শ দিয়ে গেছেন। তাঁর বিশ্বমানব-প্রেমের মূর্তির প্রতিই ব্রজেন্দ্রনাথ এভাবে মহাসভার শ্রোতাদের ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এই ধর্মমহাসভায় তিনি রাজা রামমোহনের প্রতিও তাঁর অসীম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিলেন। এর পূর্বেও তিনি কয়েকবার রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছিলেন এবং তাঁর রামমোহন সম্পর্কিত পুস্তিকাও পরে প্রচারিত হয়েছে। রামমোহনও যে নবযুগের অগ্রদূত এবং সর্বধর্ম-সমন্বয়ের পথিকৃৎ, তাও তিনি এই সভার শ্রোতৃবর্গকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আধুনিক ভারত যে তাঁর ধর্ম ও জাতীয়তার নতুন মতবাদ থেকে প্রেরণা পেয়েছে, একথা অনস্বীকার্য।

ধর্মমহাসভার অনেক আগে স্বামী বিবেকানন্দের যে স্মৃতিকথা আচার্য লিখেছিলেন, তার মধ্যেও রামকৃষ্ণের প্রতি একটা সুগভীর শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠেছিল। তরুণ বয়সের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার মধ্যে জড়িত ছিল প্রাণের আবেগ ও পবিত্রতা। নিছক বুদ্ধিবিচারের দ্বারা তা আচ্ছন্ন নয়। তাঁর লেখা থেকে স্বামীজির কৈশোর ও যৌবনের অনেক কথা, বিশেষ করে তাঁর ছাত্রজীবনের মানসিক দ্বন্দ্ব, ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি এবং তাঁর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে, জানা যায়। ১৯০৭ সালের ইংরাজী প্রবুদ্ধ ভারত মাসিক পত্রিকায় যা লিখেছিলেন, তা সংক্ষেপে এইরূপ :

"নরেন্দ্রনাথ ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাদীপ্ত তরুণ, মিশুক, স্বাধীনচেতা এবং আচরণে প্রচলিত প্রথার বিরোধী, বাহিরে শৃংখলাহীন মনে হইলেও সংযত ও প্রবল ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন। তিনি ছিলেন একজন সুগায়ক, সমাজিক-বৃত্তের মধ্যখানিও অতীব বাক্পটু। পার্থিব ছল ও ছদ্মবেশ নরেন্দ্রনাথ তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির তীব্র ও শ্লেষাত্মক বাণে বিদ্ধ করিতেন। বাহিরে যদিও অবজ্ঞা প্রকাশ পাইত, কিন্তু এই বিদ্রূপাত্মক উক্তির অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিত একটি অতি কোমল হৃদয়। তিনি ছিলেন প্রভুত্বব্যঞ্জক

ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কথা বলার সময় কর্তৃত্বভাব ব্যক্ত হইত। চক্ষে এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল, যাহাতে শ্রোতারা অভিভূত হইয়া যাইত।

"তিনি ছিলেন স্বভাবতঃ ভক্তিপ্রবণ। সুতরাং পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক মতবাদের বাঁধাধরা নানারূপ যুক্তি ও সমস্যা-সমাধানের সাধারণ বুদ্ধির বিচার তাঁহার মনঃপূত হইত না। ফলে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইতে ব্যগ্র হন। পুস্তকে বা অন্যত্র কেবল সদুত্তর না পাওয়ায় তাঁহার অন্তরে প্রচণ্ড ঝড় বহিতে থাকে। এই সময় তাঁহার অন্তরের আন্দোলন বাহিরের সাধারণ উদাসীনতা, শ্লেষ ও ঘৃণার ভাব দ্বারা লুকাইয়া রাখিতেন। সঙ্গীত কিন্তু তাঁহার প্রাণে খুবই সাড়া জাগাইত।

"প্রত্যক্ষ কথোপকথন ও স্বকীয় অভিজ্ঞতা হইতে হৃদয়ঙ্গম করার তাঁহার যতটা শক্তি ছিল, পুস্তকপাঠে ততটা ছিল না। তাঁহার ভাব ছিল একটি জীবন অন্য জীবনকে উদ্দীপিত করিবে,— এক চিন্তা অন্য চিন্তা প্রজ্বলিত করিবে।

"সঙ্গীত-চর্চায় তিনি এমন সব লোকের সংস্পর্শে আসিতেন, যাহাদিগের আচরণ ও চরিত্র সম্বন্ধে তিনি তীব্র ও স্পষ্ট ঘৃণা বোধ করিতেন। কিন্তু তাঁহার মিশুক স্বভাবের জন্য তিনি তাহাদিগের সঙ্গ বর্জন করিতে পারিতেন না। মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় গানের আসরে ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁহার সঙ্গী হইলে তিনি স্বস্তি লাভ করিতেন।

"ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁহার মধ্যে এক মহৎ উদ্দীপনাময় ও নিষ্কলুষ চরিত্রের সন্ধান পান। নরেন্দ্রনাথ শুষ্ক শুদ্ধাচারী বা স্বভাবতঃ বিষণ্ণ ভাবের মানুষ ছিলেন না। তিনি কখন কখন অভিধান-বহির্ভূত রূঢ় ভাষা ব্যবহার করিতেও দ্বিধা করিতেন না। মনে হইত যেন তিনি প্রচলিত প্রথাকে আঘাত করিয়া এবং তথাকথিত ভদ্রতাকে বিদ্রূপ করিয়া অস্বাভাবিক আনন্দলাভ করিতেছেন।

তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল ব্যতীত অন্যের নিকট এই সকল রঙ্গ-কৌতুককালে, তিনি যাহা নহেন তাঁহাকে সেরূপ খেয়ালী ও গোলমেলে মনে হইত। অন্তরে তিনি বাসনা এবং কল্পনার সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন। তিনি স্থিরনিশ্চয় ছিলেন যে, দেহের ও মনের পবিত্রতা নষ্ট করা মূর্খতা ও নিজের জীবনকে ব্যর্থ করা ছাড়া আর কিছু নয়।

তিনি সর্বদা এমন এক শক্তি অন্বেষণ করিতেছিলেন, যাহা তাঁহাকে বন্ধন ও এই বৃথা দ্বন্দ্ব হইতে উদ্ধার করিতে পারে। ব্রজেন্দ্রনাথ অবশ্য অন্যভাবে ভাবিত ছিলেন। তাই উভয়ের সমস্যা একরূপ ছিল না, এবং তাহার সমাধানও একরূপ হওয়া সম্ভব ছিল না। নরেন্দ্র চাহিতেছিলেন এমন একজন রক্তমাংসের মানুষ, যিনি পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন এবং শক্তি দ্বারা তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারেন ও তাঁহার প্রাণে শান্তি দিতে পারেন।

"এই সময় নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের নৈতিক উপদেশাদিতে আর সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া বহু ধর্মনেতার নিকট যাতায়াত করিতে থাকেন; এইরূপেই সংশয়ান্বিত মনে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস দেবের নিকট উপস্থিত হন। কিন্তু পরমহংসদেব এমন প্রত্যক্ষানুভূতির কথা বলেন, যাহা আর তাঁহাকে কেহ কখনও বলেন নাই এবং তাঁহার শক্তি দ্বারা প্রাণে শান্তি আনিয়া দেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের বিদ্রোহী বুদ্ধি সহজে বিশ্বাস করে নাই; বহু পরীক্ষার পর ক্রমে ক্রমে তিনি পরমহংসদেবের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। চাক্ষুষ প্রমাণ পাইয়া তাঁহার স্থির বিশ্বাস হয়।

"নরেন্দ্রনাথের ন্যায় একজন স্বাধীন চিন্তাশীল যুবকের এই পরিবর্তন ব্রজেন্দ্রনাথকে বিচলিত ও আশ্চর্যান্বিত করে। তিনি মনে করেন, নরেন্দ্রনাথের এ কি অধোগতি! যিনি সবলকে বশীভূত

করিবেন, তাঁহাকেই বশ্যতা স্বীকার করিতে হইল। তবু নরেন্দ্রনাথের ভালবাসার আকর্ষণে ব্রজেন্দ্রনাথ ঘরকুনো হইয়াও দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবকে দেখিতে যান এবং এক গ্রীষ্মের প্রায় সারাদিনই সেখানে কাটান। আসিবার সময় ঘনঘটা করিয়া প্রবল ঝঞ্ঝা ও বারিপাত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বহিঃপ্রকৃতির ন্যায় অন্তরেও ঝঞ্ঝা ও বিহ্বলতা লইয়া ফিরিলেন। একটা সূক্ষ্ম অনুভূতি অবশ্য মনে উঁকি মারিতে থাকে যে, যাহা আপাততঃ বিশৃংখল ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ, তাহাও নিয়মের অধীন এবং আপাত প্রতীয়মান আত্মবিলুপ্তির মধ্যেও আত্মনির্ভরতা সম্ভব; ভ্রান্তিপূর্ণ বুদ্ধি ও প্রাথমিক বিচার এক ত্রাণকর্ত্তায় বিশ্বাস শুধু আত্মবিশ্বাসের ক্ষীণ প্রতিবিম্ব। স্বামী বিবেকানন্দের পরবর্ত্তী জীবনে ইহার সত্যতা প্রমাণিত হয়। তিনি তাঁহার গুরুদেবের ত্রাণকারী কৃপা ও শক্তিতে যাহা খুঁজিতে ছিলেন, তাহা নিশ্চিতভাবে প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বজনীন মানবতার ধর্ম ও আত্মার অবিনশ্বরত্ব প্রচার করিতে থাকেন।"

স্বামিজীর সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথের এই স্মৃতিকথা এক দিক দিয়ে একটি প্রামাণ্য দলিল। মহাস্মৃতিধর ও মহাপণ্ডিত আচার্য শীল আর এক মহাপুরুষের জীবন কাহিনীর এক অধ্যায়কে সত্যের আলোকে প্রকাশিত করে সকলের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। স্বামিজীর অতি কাছে এমন দ্রষ্টা আর কেউ ছিল না।

ব্যক্তিগত জীবনঃ—

সংসারের ঘটনাস্রোত সংযত করা বা নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা মানুষের অল্প। ব্যক্তি বা রাষ্ট্র প্রকৃষ্ট পরিকল্পনার সঙ্গে পুরুষকার প্রয়োগ করেও কর্মক্ষেত্রে অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে আশানুরূপ ফললাভ নাও করতে পারে। পার্থিব সুখ দুঃখের বা জয় পরাজয়ের সর্বময় নিয়ন্তা আর একজন মাথার উপরে আছেন। একথা মানুষ

দুঃখের মধ্যে যতটা অনুভব করে, সুখের মধ্যে ততটা নয়। ব্রজেন্দ্রনাথের জীবনে অপ্রত্যাশিত আঘাত এসেছে বারে বার। প্রিয়তমা পত্নী পরলোকগমন করলেন তাঁর যৌবনেই। আঘাত এল, সহ্য করলেন নীরবে। আবার তাঁর একমাত্র আদরের কন্যাও ঠিক যৌবনেই দেহত্যাগ করলেন। এই কন্যাকে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে বিলাতে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করেছিলেন ভবিষ্যতের অনেক আশা বুকে নিয়ে, দেশে ফেরার পরে এই স্নেহময়ী কন্যাটির বিয়ে দিয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসন্তকুমারের সঙ্গে। ধীরভাবে পরীক্ষা করলেন তিনি নিজ হৃদয়ের স্থৈর্যকে উপনিষদের জ্যোতিতে—

"গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ।"

(পণ্ডিতগণ মৃত বা জীবিত কাহারও জন্য শোক করেন না।)

রবীন্দ্রনাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথ ঃ—

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। এই বন্ধুর ক্ষনিক সাহচর্যকেও রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনই সুকৃত সম্পদ মনে করতেন। বিশ্বকবি বিশ্বের বিস্ময়। সৃষ্টি তাঁর কালজয়ী। তাঁর দৃষ্টিতে ব্রজেন্দ্রনাথও এক বিস্ময়। চিন্তা ধারায় অধিক সাদৃশ্য দেখে চিন্তিত হতে হয়। বিশ্বকবি রচনা করেছেন,—

"হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগোরে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।
....
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড়, চীন,
শকহূন-দল পাঠান-মোগল এক দেহে হল লীন।
....
হে রুদ্রবীনা, বাজো বাজো বাজো,
ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজো,

বন্ধ নাশিবে, তারাও আসিবে দাঁড়াবে ঘিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে ,
হেথা একদিন বিরাম বিহীন মহা-ওঙ্কার ধ্বনি,
হৃদয় তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিলো রণরণি।
তপস্যা বলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া –
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার
যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে ॥

আচার্য শীল লিখেছেন,—

"এই ভারত মহাসাগর তীরে, সভ্যতার দুয়ারে, পুরাকাল হইতে আজ পর্যন্ত বহু বিভিন্ন জাতি ও সভ্যতা আসিয়া মিলিত হইয়াছে। সে মিলনে ভারতের আদর্শ আরও পুষ্ট ও পরিণত হইয়াছে; কখনও সে তাহার বৈশিষ্ট্য হারায় নাই,—তাহার আদর্শের বিচ্যুতি ঘটে নাই। বিশ্বজনীন সার্ব্বভৌম আদর্শই ভারতের ভাব, তাহাই ভারতীয় সভ্যতার প্রাণস্বরূপ।.......বর্ত্তমান জগৎ আজ জড়ত্বের শৃঙ্খল পরিয়া, পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের গান গাহিয়া চলিয়াছে, আজ তাহারা ভারতের দিকে উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে—ভারতের নূতন বাণী, নূতন তত্ত্ব, সে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান শুনিবার জন্য উৎকর্ণ, উদ্‌গ্রীব।"

ভাব ও ভাষার আশ্চর্য মিল দেখে হঠাৎ বুঝি বা মনে হবে, ব্রজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটা ভাষ্য রচনা করেছেন, অথবা কবি আচার্যের ভাবকে কাব্যে রূপায়িত করেছেন। কিন্তু

না, কেউই কাউকে অনুকরণ করেন নি, কেউই কারও ভাব চুরি করেন নি। উভয়েই লিখেছেন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এবং নিজ নিজ ভাবাদর্শকে অবলম্বন করে। এর আগে আমরা আলোচনা করে দেখেছি বিবেকানন্দের উক্তি "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ" ব্রজেন্দ্রনাথেরও উক্তি; এখন দেখা যাচ্ছে সেটা রবীন্দ্রনাথেরও বাণী।

কবি ছিলেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথও। তাঁর বিচিত্র কবি-মনীষার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচিত "দি কোয়েস্ট ইটারন্যাল" (The Quest Eternal) নামক কাব্যগ্রন্থে। গ্রন্থের ভূমিকায় এর দৃশ্যগত অভিব্যক্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "কোন যুগের আদর্শ অংকিত করতে গিয়ে তিনি (কবি) কল্পনা-চিত্রণের জন্য বেছে নিয়েছেন বহু প্রকাশমান সংস্কৃতির মধ্য থেকে সেই বিশেষ গঠনভঙ্গিমা যা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন জাতিগুলির ও সভ্যতা-নিচয়ের মিলন ক্ষেত্র ও সমন্বয় সাধন হিসাবে কাজ করে এসেছে।"

এই কাব্য গ্রন্থের তিনটি অংশ: প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক। প্রথম অংশটিতে (The Ancient Hymn কল্পিত পটভূমিকা আধা গ্রীক ও আধা প্রাচ্য এবং স্তোত্রটি ব্যাকট্রিয়া (BACTRIA)-প্রত্যাগত গ্রীক পুরোহিত দ্বারা উচ্চারিত বলে ধরা হয়েছে, যিনি তাঁর দ্বীপের বাড়ীতে ফিরে এসেছেন বহু বর্ষ প্রবাসের পর,—ধরুন, তক্ষশীলায় অথবা মথুরায় যেখানে তিনি ভারতীয় ভাবধারা, ভারতীয় উপাখ্যান ও ভারতীয় কলার সঙ্গে পরিচিত ঘটিয়েছেন। আর এই ধর্তব্য বিষয়টি কোনক্রমেই অতিরঞ্জিত নয়। উপসংহারে কবি উল্লেখ করেছেন তাঁর কাব্যের তিনটি বিভাগের সংগে হেগেল মতবাদের থিসিস, অ্যান্টিথিসিস ও সিন্থিসিস (Thesis, Anti-thesis ও Synthesis) অথবা প্রাচীন হিন্দুদের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের

ধারণার কোন সম্পর্ক নেই। এই কাব্য ইংরাজীতে রচিত হওয়ার জন্য এখন আর সাধারণ পাঠকের হাতে সহজলভ্য নয়, কিন্তু কাব্যবিচারে এটি একটি সার্থক সৃষ্টি। কবিখ্যাতি তাঁর ততটা না থাকলেও কবি দৃষ্টি তাঁর রবীন্দ্রনাথেরই অনুরূপ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বপ্নের সাধ বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা উৎসবে পৌরোহিত্য করবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানালেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথকে। এটা ১৯২১ সালের ডিসেম্বরের কথা। অন্তরঙ্গ দুই বন্ধুর মিলনে সেদিন শান্তিনিকেতনের প্রান্তর ও বনবীথি অপূর্ব আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠেছিল। মুখরিত হয়েছিল শিক্ষানিকেতনের অঙ্গন, আর তার সঙ্গে কবির ও আচার্যের অন্তর। কবির কল্পনা সার্থক হয়েছে, রূপ নিয়েছে নতুন জ্ঞানতীর্থ। সভাপতির অভিভাষণে ব্রজেন্দ্রনাথ পাঠ করলেন,—

"এই আশ্রমের গুরুর অনুজ্ঞায় ও আপনাদের অনুমতিতে আমাকে যে সভাপতির ভার দেওয়া হল, তাহা আমি শিরোধার্য করে নিচ্ছি। আমি এ ভারের সম্পূর্ণ অযোগ্য। কিন্তু আজকের এই প্রতিষ্ঠান বিপুল ও বহুযুগব্যাপী। তাই ব্যক্তিগত বিনয় পরিহার করে আমি এই অনুষ্ঠানে ব্রতী হলাম। বহু বৎসর ধরে এই আশ্রমে একটা শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এই ধরণের 'শিক্ষা-সাধনার পরীক্ষা' (educational experiment) দেশে খুব বিরল। এই দেশ তো আশ্রম-সংঘ-বিহারের দেশ। কোথাও কোথাও 'গুরুকুল'-এর মতো দু'একটা এমনি বিদ্যালয় থাকলেও, এটি এক নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত। এর স্থান আর কিছুতে পূর্ণ করতে পারে না। এখানে খোলা আকাশের নিচে প্রকৃতির ক্রোড়ে মেঘ-রৌদ্র-বৃষ্টি-বাতাসে বালক বালিকারা লালিত পালিত হচ্ছে। এখানে শুধু বহিরঙ্গ-প্রকৃতির আবির্ভাব

নয়, কলা সৃষ্টির দ্বারা অন্তরঙ্গ প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় জেগে উঠেছে। এখানকার বালক বালিকারা এক-পরিবারভুক্ত হয়ে আচার্যদের মধ্যে রয়েছে। একজন বিশ্বপ্রাণ 'ব্যক্তি' (personality) এখানে সর্বদাই এর মধ্যে জাগ্রত রয়েছেন। এমনি ভাবে এই বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। আজ সেই ভিত্তির প্রসার ও পূর্ণাঙ্গতা সাধনা হতে চলল। আজ এখানে বিশ্বভারতীর অভ্যুদয়ের দিন। 'বিশ্বভারতীর' কোষানুযায়িক অর্থের দ্বারা আমরা বুঝি যে, যে 'ভারতী' এতদিন অলক্ষিত হয়ে কাজ করছিলেন, আজ তিনি প্রকট হলেন। কিন্তু এর মধ্যে আর একটি ধ্বনিগত অর্থও আছে—বিশ্ব ভারতের কাছে এসে পৌঁছবে, সেই বিশ্বকে ভারতীয় করে নিয়ে আমাদের রক্তরাগে অনুরঞ্জিত করে, ভারতের মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত করে আবার সেই প্রাণকে বিশ্বের কাছে উপস্থিত করব। সেই ভাবেই বিশ্বভারতীর নামের সার্থকতা আছে।

"একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। ভারতের মহাপ্রাণ কোন্‌টা। যে মহাপ্রাণ লুপ্ত প্রায় হয়ে এসেছে, তাকে ধরতে গিয়ে আমরা যদি বিশ্বের সঙ্গে কারবার স্থাপন ও আদান-প্রদান না করি; তবে আমাদের আত্মপরিচয় হবে না। অন্য সকলকে তাদের আত্ম-পরিচয় বুঝতে সাহায্য করার দ্বারাই একজন নিজেকে বুঝতে পারে' (each can realize himself only by helping others as a whole to realize themselves) এ যেমন সত্য, এর বিপরীত (converse) অর্থাৎ 'প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আত্মপরিচয় লাভে সাহায্যের দ্বারাই অন্য সকলেও আত্মপরিচয় লাভ করতে পারে' (others can realize themselves by helping each individual to realize himself)

এ তেমনি সত্য। অপরে আমার লক্ষ্যের পথে, যাবার পথে যেমন মধ্যবর্ত্তী, তেমনি আমিও তার মধ্যবর্ত্তী; কারণ, আমাদের উভয়কে যেখানে ব্রহ্ম বেষ্টন করে আছেন, সেখানে আমরা এক, একটি মহা ঐক্যে অন্তরঙ্গ হয়ে আছি। এ ভাবে দেখতে গেলে, বিশ্বভারতীতে, ভারতের প্রাণ কী তার পরিচয় পেতে হবে; তাতে করে জগতের যে পরিচয় ঘটবে, তার রূপে আত্মাকে প্রতিফলিত দেখতে পাব।

"আমি আজ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। আজ জগৎ জুড়ে একটি সমস্যা রয়েছে। সর্ব্বত্রই একটা বিদ্রোহের ভাব দেখা যাচ্ছে, — সে বিদ্রোহ প্রাচীন সভ্যতা, সমাজতন্ত্র, বিদ্যাবুদ্ধি, অনুষ্ঠান, সকলের বিরুদ্ধে। আমাদের আশ্রম, দেবালয় প্রভৃতি যা কিছু হয়েছিল, তা যেন সব ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। বিদ্রোহের অনল জ্বলছে, তা অর্ডার-প্রগ্রেসকে (Order and-Progress = শৃংখলা ও উন্নতি) মানে না, রিফর্ম (reform) চায় না, কিছুই চায় না। যে মহাযুদ্ধ হয়ে গেল, এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে তার চেয়ে বড়ো যুদ্ধ চলে আসছে, গত মহাযুদ্ধ তারই প্রকাশ মাত্র। এই সমস্যার পূরণ কেমন করে হবে, শান্তি কোথায় পাওয়া যাবে। সকল জাতিই এর উত্তর দেবার অধিকারী। এই সমস্যায় ভারতের কী বলবার আছে, দেবার আছে?

"আমরা এত কালের ধ্যান ধারণা থেকে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, তার দ্বারা এই সমস্যা পূরণ করবার কিছু আছে কিনা। য়ুরোপে ও সম্বন্ধে যে চেষ্টা হচ্ছে সেটা পোলিটিক্যাল অ্যাড্মিনিস্ট্রেশনের (political administration=রাজ্য শাসন ব্যবস্থা) দিক দিয়ে হয়েছে। সেখানে রাজনৈতিক ভিত্তির উপর

ট্রীটি, কনভেন্‌শন্‌, প্যাক্টের (Treay, Convention, Pact = সন্ধি, রাজ্যগুলির প্রতিনিধি সম্মেলন চুক্তি) ভিতর দিয়ে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা হচ্ছে, এ হবে এবং হবার দরকারও আছে। দেখছি সেখানে মাল্‌টিপল্‌ অ্যালায়েন্স্‌ (Multiple Alliance = বহু শক্তির জোট) হয়েও হল না, বিরোধ ঘটল। আর্‌বিট্রেশন কোর্ট এবং হেগ কনফারেন্সে হল না, শেষে লীগ্‌ অব্‌ নেশন্‌স্‌—এ গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। (Arbitration Court = আন্তর্জাতিক বিচার সভা, Hague Conference = হেগ সম্মিলনী, League of Nations = জাতি সংঘ)। তার অবলম্বন হচ্ছে 'অস্ত্রসজ্জার সীমিত করণ' (limitation of armaments)। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, এ ছাড়া আরও অন্য দিকে চেষ্টা করতে হবে; কেবল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক দিকে এর হওয়া দরকার। 'জগতের সকল জাতির যুগপৎ অস্ত্রসজ্জা ত্যাগের' (Universal-simulteneous disarmament of all nations) জন্য নূতন মানবিকতাবাদের ধর্ম আন্দোলন' Religious Movement for Humanism) হওয়া উচিত। তার ফল স্বরূপ যে 'কার্যকরী সংগঠন' (machinery) হবে, তা পার্লামেন্ট বা ক্যাবিনেটের ডিপ্লোম্যাসির (পার্লামেন্ট = লোক সভা, ক্যাবিনেট = মন্ত্রীসভা, ডিপ্লোম্যাসি = কূটনীতি) অধীনে থাকবে না। পার্লামেন্ট সমূহের জয়েন্ট সীটিং (সমবেত অধিবশন) তো হবেই, সেই সঙ্গে বিভিন্ন 'জাতিরও' (people এর) কন্‌ফারেন্স হলে তবেই শান্তির প্রতিষ্ঠা হতে পারে। (কন্‌ফারেন্স = সম্মেলন)। কিন্তু একটা জিনিষ আবশ্যক হবে, —'সর্বসাধারণের জীবন, সর্বসাধারণের' (mass-এর life, mass-এর religion)। বর্ত্তমান কালে কেবল-মাত্র 'এককের মুক্তি' (individnal selvation) চলবেনা;

সর্বমুক্তিতেই এখন মুক্তি, না হলে মুক্তি নেই। ধর্মের এই 'সর্বসাধারণের জীবনের' (mass life)-এর দিকটা সমাজে স্থাপন করতে হবে।

"ভারতের এ সম্বন্ধে কী বানী হবে। ভারতও শান্তির অনুধাবন করেছে, চীন দেশও করেছে। চীনে সামাজিক দিক দিয়ে তার চেষ্টা হয়েছে। যদি 'মানুষের সামাজিক মৈত্র,' (*Social-fellowship of man with man*) হয়, তবেই 'আন্তর্জাতিক শান্তি' (*International peace*) হবে, নয়তো হবে না। কনফুসিয়াসের গোড়ার কথাই এই যে, সমাজ একটা পরিবার, শান্তি সামাজিক 'মৈত্রীর' (ফেলোশিপের) উপর স্থাপিত; সমাজে যদি শান্তি হয়, তবেই বাইরে শান্তি হতে পারে। ভারতবর্ষে এর আর একটা ভিত্তি দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে অহিংসা, মৈত্রী, শান্তি। প্রত্যেক ব্যক্তিতে *Individual*-এ) বিশ্বরূপ দর্শন এবং তারই ভিতর ব্রহ্মের ঐক্যকে অনুভব করা, এই ভাবের মধ্য যে 'শান্তি' (*peace*) আছে, ভারতবর্ষ তাকেই চেয়েছে। ব্রহ্মের ভিত্তিতে আত্মাকে স্থাপন করে যে 'শান্তিচেতনা' (*Peace compact*) হবে, তাতেই শান্তি আনবে। এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় — চীন দেশের সোশ্যাল ফেলোশীপ এবং ভারতের আত্মার শান্তি এই দুইই চাই। নতুবা লীগ্ অব নেশন্স্ — এ কিছু হবে না। 'বিশ্ব যুদ্ধের' (গ্রেটওঅর-এর) থেকেও বিশালতর যে দ্বন্দ্ব জগৎ জুড়ে চলেছে, তার জন্য ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে বিশ্বভারতীকে বাণী দিতে হবে"।

"ভারতবর্ষ দেখেছে যে, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে যে 'রাজ্য' (*state*) আছে, তা কিছু নয়। সে বলেছে যে, নেশনের ('জাতির') বাহিরেও মহাসত্য আছে, সনাতন ধর্মেই তার স্বাজাত্য রয়েছে।

যেখানে আত্মার বিকাশ ও ব্রহ্মের আবির্ভাব, সেখানেই তাহার দেশ। ভারতবর্ষ ধর্মের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই "সীমানাহীন জাতীয়তা' (***extra-territorial nationality***-তে) বিশ্বাস করেছে। এই ভাবের অনুসরণ করে লীগ অব্ নেশনস্ এর 'জাতীয়তার' (ন্যাশন্যালিটির) ধারণাকে সংশোধিত করতে হবে। তেমনি আত্মার দিক দিয়ে — 'সীমানাহীন সার্বভৌম ক্ষমতা'র (extra-territorial sovereignty-র) ভাবকে স্থান দিতে হবে। এমন ভাবে 'বিশ্ব-সংঘ' (Federation of the World) স্থাপিত হতে পারে, এখনকার সময়ের উপযোগী করে লীগ্ অব-নেশন্স্-এ 'সীমানাহীন জাতীয়তা'র (extra territorial-nationality-র) কথা উত্থাপন করা যেতে পারে। ভারতবর্ষের-রাষ্ট্রীয় দিক দিয়ে এই বাণী দেবার আছে। আমরা দেখতে পাই যে, বৌদ্ধ প্রচারকগণ এই ভাবটি প্রচার করেছিলেন যে, প্রত্যেক রাজার 'নিয়মতন্ত্র' এমন হওয়া উচিত, যা শুধু নিজের জাতির নয়, অপর সব জাতির সমান ভাবে হিতসাধন করতে পারবে। ভারতের ইতিহাসে এই বিধিটি সর্বদা রক্ষিত হয়েছে, তার রাজার জয়ে পরাজয়ে, রাজচক্রবর্ত্তী হয়েও, এমনি করে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধকে স্বীকার করেছেন।

"সামাজিক জীবন সম্বন্ধে ভারতবর্ষের 'বাণী' (মেসেজ) কী। আমাদের এখানে গ্রুপ ও কম্যুনিটির স্থান খুব বেশি। (গ্রুপ= গোষ্ঠী, কম্যুনিটি=সমাজ)। এরা 'রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে মধ্যবর্ত্তী সংস্থা' (intermediary body between state and individual)। রোম প্রভৃতি দেশে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ফলে 'রাষ্ট্র ও ব্যক্তিতে' (স্টেট ও ইনডিভিজুয়ালে) বিরোধ বেধেছিল; শেষ ব্যক্তিবাদের (ইনডিভিজুয়ালিজ্‌মের) পরিণতি হল 'নৈরাজ্যবাদে'

(অ্যানার্কিতে) এবং রাষ্ট্র (স্টেট) 'সামরিক সমাজতন্ত্রে' (মিলিটারী সোশ্যালিজম) গিয়ে দাঁড়াল। আমাদের দেশের ইতিহাসে গ্রামে বর্ণাশ্রমে এবং ধর্মসংঘের ভিতরে কম্যুনিটির জীবনকেই দেখতে পাই। বর্ণাশ্রমে যেমন প্রতিব্যক্তির কিছু প্রাপ্য ছিল, তেমনি তার কিছু দেয়ও ছিল, তাকে কতকগুলি নির্ধারিত কর্তব্য পালন করতে হত। 'ব্যক্তির মধ্যে সমাজ' (Community in the Individual) যেমন আছে, তেমনি 'সমাজের' মধ্যে ব্যক্তি'ত্ব (the individual in the Community) আছে। প্রত্যেকের ব্যক্তি জীবনে 'গোষ্ঠীগত ব্যক্তিত্ব' এবং 'একক ব্যক্তিত্ব' (গ্রূপ পার্সনালিটির এবং ইন্‌ডিভিজুয়াল পার্সনালিটি) জাগ্রত আছে, এই উভয়েরই সমান প্রয়োজন আছে। 'গোষ্ঠীগত ব্যক্তিত্বের' (গ্রূপ পার্সন্যালিটির) ভিতর 'একের'-(ইন্‌ডিভি-জুয়ালের) স্বাধিকারকে স্থান দেওয়া দরকার। আমাদের দেশে ত্রুটি রয়ে গেছে যে, আমাদের 'একক ব্যক্তিত্বের' (ইন্‌ডিভিজুয়াল পার্সন্যালিটির) বিকাশ হয়নি, 'রাষ্ট্রের মধ্যে শক্তির সমন্বয়সাধনও (Co-ordination of power in the state-ও) হয়নি। আমরা 'একক ব্যক্তিত্বের' (ইন্‌ডিভিজুয়াল পার্সন্যালিটির) দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, বূহবদ্ধ শত্রুর হাতে আমাদের লাঞ্ছিত হতে হয়েছে।

"আজকাল য়ুরোপে 'গোষ্ঠীনীতির' (group principle-এর) দরকার হচ্ছে। সেখানে 'রাজনৈতিক সংগঠন' 'অর্থনৈতিক সংগঠন' (political organisation, economic organisation) এ সবই 'গোষ্ঠী' (group) গঠন করার দিকে যাচ্ছে। আমাদেরও এই পথে সমস্যাপূরণ করবার আছে। আমাদের যেমন য়ুরোপের কাছ থেকে 'রাষ্ট্রের কেন্দ্রীকরণ ও সংগঠন-

নীতি' (Centralization ও Organization) নেবার আছে, তেমনি য়ুরোপকেও গোষ্ঠীনীতি' (group principle) দেবার আছে। আমরা সে দেশ থেকে 'অর্থনৈতিক সংগঠন'কে (economic organization কে) গ্রহণ করে আমাদের 'গ্রামসমাজকে' (Village Community কে) গড়ে তুলব। কৃষিই আমাদের জীবনযাত্রার প্রধান অবলম্বন, সুতরাং 'পল্লী সংগঠনের' (ruralization-এর) দিকে আমাদের চেষ্টাকে নিয়োগ করতে হবে। অবশ্য আমি সেজন্য বলছি না যে, 'নগর-জীবনকে' (town life কে) উন্নত (develop) করতে হবেনা; তারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমাদের ভূমির সঙ্গে প্রাণের যোগসাধন করতে হবে। ভূমির সঙ্গে 'মালিকানার' (ownership-এর) সম্বন্ধ হলে তবে স্বাধীনতা থাকতে পারে। কারখানার জীবনও দরকার আছে, কিন্তু ভূমি ও বাস্তুর সঙ্গে 'ব্যক্তিগত মালিকানার' (individual ownership-এর) যোগকে ছেড়ে না দিয়ে 'বহুল-পরিমাণ উৎপাদন' (large-scale production) আনতে হবে, বড়ো আকারে শক্তিকে (energy-কে) আনতে হবে, কিন্তু দেখতে হবে কলের 'শক্তি' (energy) মানুষের আত্মাকে পীড়িত অভিভূত না করে, যেন জড় না করে দেয়। সমবায় প্রণালীর দ্বারা হাতের কলকেও দেশে স্থান দিতে হবে। এমনিভাবে 'অর্থনৈতিক সংগঠনে' (economic organization-এ) ভারতকে আত্মপরিচয় দিতে হবে। আমাদের "জীবনের মান" (স্টাণ্ডার্ড অব্ লাইফ্) এত নিম্নস্তরে আছে যে, আমরা "ক্ষয়িষ্ণু" (decadent) হয়ে মরতে বসেছি। যে প্রণালীতে "সুদক্ষ সংগঠনের" (efficient organisation এর) নির্দেশ করলাম, তাকে না ছেড়ে বিজ্ঞানকে আমাদের প্রয়োজনসাধনে লাগাতে হবে। আমাদের

বিশ্বভারতীতে তাই, রাষ্ট্রনীতি, সমাজধর্ম ও অর্থনীতির যে যে 'সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান' (ইন্সটিট্যুশন) পৃথিবীতে আছে, সে সবকেই 'অনুশীলন' (স্টাডি) করতে হবে, এবং আমাদের দৈন্য কেন ও কোথায় তা বুঝে নিয়ে আমাদের অভাব পূরণ করতে হবে। কিন্তু এতে করে নিজের প্রাণকে ও সৃজনীশক্তিকে যেন বাইরের চাপে নষ্ট না করি। যা কিছু গ্রহণ করব, তাকে ভারতের ছাঁচে ঢেলে নিতে হবে। আমাদের সৃজনীশক্তির দ্বারা তারা 'আমাদের রক্তমাংসে সংমিশ্রিত' (coined into our flesh and blood) হয়ে যাওয়া চাই।

"ভিন্ন ভিন্ন জাতির 'জীবনযাত্রার পরিকল্পনা' (স্কীম অব লাইফ) আছে, কিন্তু তাদের ইতিহাস ও ভূপরিচয়ের মধ্যেও একটি বৃহৎ ঐক্য আছে, এই বিভিন্নতার মধ্যেও এক জায়গায় 'মানব জাতির ঐক্য' (unity of human race) তাদের সেই ইতিহাস ও ভূগোলের বিভিন্ন 'পরিবেশের' (environment-এর) জন্য যে 'জীবনের মূল্যবোধ' (life values) সৃষ্টি হয়েছে, পরস্পারের যোগাযোগের দ্বারা তাদের বিস্তৃতি হওয়া প্রয়োজন। এই 'জীবনের পরিকল্পনাগুলির' (লাইফ-স্কীমগুলির) আদান-প্রদানে বিশ্বে তাদের বৃহৎ লীলাক্ষেত্র তৈরী হবে।

"আমাদের জাতীয় চরিত্রের কী কী অভাব আছে, কী কী আমাদের বাইরে থেকে আহরণ করতে হবে। আমাদের মূল ত্রুটি হচ্ছে, আমরা বড়ো একপেশে— 'ভাবপ্রবণ' (ইমোশনাল)। আমাদের ভিতরে 'ইচ্ছাশক্তি ও বুদ্ধির' (will ও intellect এর) মধ্যে 'অধ্যাত্মবাদিতা ও বস্তুবাদিতার' (সাবজেক্টিভিটি ও অব-জেক্টিভিটির) মধ্যে চিরবিচ্ছেদ ঘটেছে। আমরা হয় খুব 'অধ্যাত্মবাদী' (সাবজেকটিভ্), নয়তো খুব 'সার্বজনীন' (য়ুনিভার-

সাল)। অনেক সময় আমরা 'সার্বজনীনতার' (য়ুনিভার্সালিজ্‌মের) বা সাম্যের চরম সীমায় চলে যাই, কিন্তু 'বৈষম্য নির্ণয়ে' (differentiation-এ) যাইনা। আমাদের 'বস্তুবাদিতার' (অবজেক্‌টিভিটির) পূর্ণ বিকাশ হওয়া দরকার। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও 'নিরীক্ষণের' (অবজারভেশনের) ভিতর দিয়ে মনের সত্যানুবর্ত্তিতাকে ও শৃংখলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমাদের 'বুদ্ধিবৃত্তির' (intellect-এর) 'গুণগত বিকাশের' (character-এর) অভাব আছে, সুতরাং আমাদের 'বুদ্ধিবৃত্তির সততার' (intellectual honesty-র) প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। তাহলেই দেখব যে, কর্ত্তব্যবোধ জাগ্রত হয়েছে। অন্যদিকে আমাদের 'নৈতিক ও ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধকে' (moral and personal responsibilityর বোধকে) জাগাতে হবে, 'আইন ন্যায়বিচার ও সাম্যভাবের' (Law, Justice ও Equality-র) যা লুপ্ত হয়ে গেছে, তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে—এ সকল বিষয়ে আমাদের শিক্ষা আহরণ করতে হবে। আমাদের মধ্যে বিশ্বকে না পেলে আমরা নিজেকে পাব না। তাই বিশ্বরূপকে প্রতিষ্ঠিত করে আমরা আত্মপরিচয় লাভ করব এবং আমাদের বাণী বিশ্বকে দেব।

"এ দেশে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, কিন্তু সেখান থেকে 'ঢালাই লোহা ও নিখুঁত নির্ধারিত মানের উৎপাদিত দ্রব্য' (rigid standardized product) তৈরী হচ্ছে। শান্তিনিকেতনে 'স্বাভাবিকতার' (naturalness-এর) স্থান হয়েছে, আশাকরি বিশ্বভারতীতে সেই 'স্বতঃস্ফূর্ত্ততার' (spontanityর) বিকাশের দৃষ্টি থ করবে। 'বিশ্ববিদ্যালয়কে' (য়ুনিভার্সিটিকে) জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলা যেতে পারে। এশিয়ার 'প্রতিভা' (genius) 'বিশ্বজনীন মানবতাবাদের' (ইউনিভার্সাল হিউম্যানিজ্‌মের)

দিকে, অতএব ভারতের এবং এশিয়ার 'স্বার্থে' (interest-এ) এরূপ একটি 'বিশ্ববিদ্যালয়ের' (য়ুনিভার্সিটির) প্রয়োজন আছে। পূর্বে যে সংঘ ও বিহারের দ্বারা ভারতের সার্থকতা-সাধন হয়েছিল, তাদেরই এ যুগের উপযোগী করে, সেই পুরাতন আরণ্যককে বিশ্ব-ভারতী রূপে এখানে পত্তন করা হয়েছে।

৮ই পৌষ, ১৩২৮ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল।
শান্তিনিকেতন। (ডিসেম্বর, ১৯২১)

এই অভিভাষণের মধ্যে যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি মননশীলতার প্রকাশ হয়েছে, সমসাময়িক কোন লেখকের বা শিক্ষাবিদের রচনার মধ্যে আমরা তা দেখতে পাইনা। যুগ, জাতি ও বিশ্বের প্রকৃত প্রয়োজন কি, তা কেবল দু-চারজন ধ্যানী মনীষীর চোখেই ধরা পড়েছিল, ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্বের সেই দু-চারজনের একজন। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার প্রকৃত আদর্শ কি হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে তাঁর আর্ষ অভিমত বিশ্বকবি কর্তৃক সর্বৈব স্বীকৃত।

এরপর বিশ্বকবির সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথের দুটি বিশেষ সাক্ষাৎকার ঘটে। একবার পরবছর ১৯২২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ও আর একবার ১৯২৮ সালের জুন মাসে। ১৯২২ সালে কবি পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন এবং সিংহলেও গেছলেন। কবি পুনাতেই তাঁর পশ্চিম ভারত ভ্রমণ শেষ করে মহীশূর যান। ব্রজেন্দ্রনাথ তখন ওখানের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভাইস-চ্যান্সেলার)। বিশেষ আমন্ত্রণ ছিল তাঁর কবিকে। কবির বিশিষ্ট সহযাত্রী পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভি (Sylvan Lavi)-ও ভারত পরিদর্শন করছিলেন। সিলভ্যাঁ ছিলেন ভারতীয় ভাষা ও ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ ফরাসী মনীষী। ২৭শে ও ২৮শে সেপ্টেম্বর কবি সিলভ্যাঁসহ বাঙ্গালোরে ব্রজেন্দ্রনাথের অতিথি হন। ব্রজেন্দ্র-

নাথ এঁদের যথোচিত অভ্যর্থনা করেন। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বকবির বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দু'দিন এখানে থাকবার পর তিনি ও তাঁর বিশিষ্ট সঙ্গী মাদ্রাজ চলে যান। এঁরা আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের সরল, অমায়িক ও মধুর ব্যবহারে এবং বুদ্ধিদীপ্ত কথোপকথনে অত্যন্ত মুগ্ধ হন। তাঁর অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রা, বহু বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য ও তত্ত্বজ্ঞান সিলভ্যাঁ লেভিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

১৯২৮ সালের সাক্ষাৎটা ছিল আকস্মিক। মে মাসের মাঝামাঝি কবি সদলবলে ইউরোপ যাবার জন্য রওনা হয়েছিলেন কলকাতা থেকে জলপথে। কলম্বো পৌঁছেই তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর ইউরোপ যাত্রা বাতিল করে দিয়ে দক্ষিণ ভারতের কয়েক জায়গা দিয়ে বাংলায় ফিরে আসতে মনস্থ করেন। এবারে তাঁর প্রথম আকর্ষণ পণ্ডীচেরী এবং তারপর বাঙ্গালোর। পণ্ডীচেরীতে থাকেন মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ। সেই যে কবে তিনি ১৯১০ সালে বাংলা ছেড়ে চলে এসেছেন, মায়ামোহ কাটিয়ে মগ্ন হয়েছেন যোগসাধনায় সমুদ্রের তীরে। বিশ্বের বিস্ময় আর এক বাঙ্গালী তাপস। কবির কৌতূহল ছিল অনেক দিনের। তাঁকে দেখার জন্য একদিন বিশেষ সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়েছিল আশ্রমের নিয়ম ভঙ্গ করে। সেটা ছিল ২৯ শে মে। কবি ব্রজেন্দ্রনাথকেও সংবাদ দিয়েছিলেন। বাঙ্গালোরে তাঁর কাছে থাকতে চান কয়েক দিন। সাগ্রহে প্রতীক্ষা করেছিলেন আচার্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে সদলবলে গিয়ে পৌঁছালেন জুনের মাঝামাঝি। বিশ্রাম নিলেন ব্রজেন্দ্রনাথের বন্ধুত্বের শান্তিমাখা ছায়ায়। অসুস্থতার জন্য কোথাও কোন সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিলেন না এবারে। কেবল বাড়িতে বসে নিশ্চিন্ত অবসরে "শেষের কবিতা" উপন্যাসখানি

লিখে শেষ করলেন। আচার্যের প্রীতিমুগ্ধ কবি জুনের শেষে ফিরলেন সোজা শান্তিনিকেতন।

মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে ব্রজেন্দ্রনাথ মহীশূরের শিক্ষা-বিভাগের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। জীবন সায়াহ্নে জন্মস্থানা কলকাতায় ফিরে এসেও তাঁর বিশ্রাম ছিলনা। নানা প্রতিষ্ঠান ও বহুব্যক্তির সঙ্গে ছিল তাঁর নিত্য সংযোগ। ১৯৩৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে রাজা রামমোহণের যে শতবার্ষিক স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হয়, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং ভাষণ প্রদান করেছিলেন। এরপর ১৯৩৭ সালে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ধর্মমহাসভায়ও ব্রজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ে বিভিন্ন দিন অভিভাষণ দিয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেছিলেন। বাহাত্তর বছর বয়সের সময় তাঁর গুণমুগ্ধ ও অনুগত বহু শিক্ষাব্রতী, বিদ্যার্থী ও বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ তাঁর জন্মজয়ন্তী পালন করে তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও সেদিন তাঁর সারা জীবনের সুহৃদকে যেভাবে হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন, তা আমাদের চিরদিন স্মরণে রাখবার মত। তিনি লিখেছেন,—

আচার্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল,

সুহৃদ্বরেষু।

জ্ঞানের দুর্গম ঊর্দ্ধে উঠেছ সমুচ্চ মহিমায়,
যাত্রী তুমি, যেথা প্রসারিত তব দৃষ্টির সীমায়
সাধন-শিখর শ্রেণী; যেথায় গহন-গুহা হতে
সমুদ্রবাহিনী বার্তা চলেছে প্রস্তরভেদী স্রোতে
নব নব তীর্থ সৃষ্টি করি, যেথা মায়া-কুহেলিকা

ভেদি উঠে মুক্তদৃষ্টি তুঙ্গশৃঙ্গ, পড়ে তাহা লিখা
প্রভাতের তমোজয় লিপি; যেথার নক্ষত্রলোকে
দেখা দেয় মহাকাল আবর্ত্তিয়া আলোকে আলোকে
বহ্নিমণ্ডলের জপমালা; যেথায় উদয়াচলে
আদিত্যবরণ যিনি, মর্ত্যধরণীর দিগঞ্চলে
অবাবৃত করি দেন অমর্ত্য রাজ্যের জাগরণ
তপস্বীর কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্ছ্বসিয়া— শুন বিশ্বজন,
শুন অমৃতের পুত্র, হেরিলাম মহান্ত পুরুষ
তমিস্রের পার হতে তেজোময়, যেথায় মানুষ
শুনে দৈববাণী। সহসা পায় সে দৃষ্টি দীপ্তিমান,
দিক্‌সীমাপ্রান্তে পায় অসীমের নূতন সন্ধান।
বরেণ্য অতিথি তুমি বিশ্বমানবের তপোবনে,
সত্যদ্রষ্টা, যেথা যুগ-যুগান্তরে ধ্যানের গগনে
গূঢ় হতে উদ্ধারিত জ্যোতিষ্কের সম্মিলন ঘটে,
যেথায় অংকিত হয় বর্ণে বর্ণে কল্পনার পটে
নিত্যস্থন্দরের আমন্ত্রণ। সেথাকার শুভ্র আলো
বরমাল্যরূপে সমুদার ললাটে জড়ালো
বাণীর দক্ষিণ পাণি।
মোরে তুমি জানো বন্ধু বলি,
আমি কবি আনিলাম ভরি মোর ছন্দের অঞ্জলি
স্বদেশের আশীর্বাদ, বিদায় কালের অর্ঘ্য মোর
বাহুতে বাঁধিনু তব সপ্রেম শ্রদ্ধার রাখীডোর।

বাং—১৩৪২ … … … রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রজেন্দ্রনাথের শিল্পদৃষ্টি কত তীক্ষ্ণ ছিল তার পরিচয় আমরা

পাই তাঁর সমালোচনা পুস্তক "নিউ এসেজ্ ইন্ কৃটিসিজম্" (*New Essays in Critisism* : *1902*-এর মধ্যে। এর প্রবন্ধগুলি প্রথমে 'ক্যালকাটা রিভিউ' (*Calcutta Review*) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সুগভীর চিন্তা, রসবোধ ও বিভিন্ন সাহিত্য সম্বন্ধে অফুরন্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন না থাকলে যে এরূপ সমালোচনা লেখা যায় না, তা রসজও পাঠক মাত্রেই স্বীকার করবেন। আলোচ্য বিষয়গুলি ছিল ব্যাপক। শিল্পতত্ত্বের সঙ্গে দার্শনিকতত্ত্ব নিয়েও আলোচনা করেছেন। যেমন,—

1. *New Romantic Movement*=নূতন রোমান্টিক আন্দোলন।
2. *Philosophy of Art*=শিল্পতত্ত্ব।
3. *Thesis*=থিসিস='নয়'
4. *Anti-Thesis*=অ্যান্টিথিসিস্='প্রতিনয়'।
5. *Synthesis*=সিনথিসিস্='সমন্বয়'।
6. *Self-Conscionsness*=সেলফ্ কনসাস্নেস =আত্মসচেতনা।
7. *History of Mind*=মনের ইতিহাস।
8. *The Myth Movement in Hyperion* =হাইপারিয়নে অতিকাল্পনিকতা আন্দোলন।

তিনি আলোচনা করেছেন বাংলা সাহিত্যে 'নিও রোমান্টিক' আন্দোলনের ধারা, সূত্র ধরেছেন ফরাসী বিপ্লবোত্তর বিভিন্ন সাহিত্যে এই আন্দোলনের উদ্ভব থেকে। সু-প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক হেগেলের 'শিল্পের গূঢ়তত্ত্ব' (*Pholosophy of Art*) সম্বন্ধে মতবাদের সমালোচনা। অন্যান্য প্রবন্ধের বিষয়-বস্তুও বেশ

শক্ত। গভীর মননশীলতা না থাকলে তাঁর বিষয়বস্তুগুলি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হতে পারেনা কোন সাধারণ পাঠকের।

প্রথম জীবনে তিনি দার্শনিক হেগেলের মতবাদের দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন। পরে তাঁর এই প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে নিজের একটী স্বাধীন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তিনি। 'নিও রোমান্টিক মুভমেণ্ট' আলোচনায় তিনি হেগেলের মতবাদের সংস্কার সাধনের প্রয়াসী হন। হেগেল বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক, জীবিত কাল ১৭৭০—১৮৩১। তাঁর মতবাদকে 'বিজ্ঞানবাদ' বা 'পরম-চেতন-বাদ' বলে বর্ণনা করা হয়। তাঁব মতে 'পরম চেতন সত্তা' (*Absolute*) সমগ্র বিশ্বের অন্তর্নিহিত সত্য। চিন্তা বা প্রজ্ঞা এই পরমের স্বরূপ। গতিশীলতাই এর প্রধান লক্ষণ। দার্শনিক তত্ত্বের ভিত্তিতে হেগেল ধর্ম, শিল্প ও বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করেছেন। হেগেলের মতে এই পরমের মধ্যেই আমরা সত্য, শিব ও সুন্দরের সার্থক অভিব্যাক্তি দেখতে পাই। নয়, প্রতিনয় ও সমন্বয় (*Thesis—Antethesis—Synthesis*) এই ত্রিভঙ্গ নিয়মে এর গতিশীলতা অটুট থাকে। ব্রজেন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলীতে এই মতবাদের সংস্কার চেষ্টা বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়। দার্শনিক হেগেলের বিচার ধারাতে ত্রুটি বিচ্যুতি ও তার সীমাবদ্ধতা নির্ণয় করা এবং তাকে সংশোধন করার মত সাহস ও শক্তি ব্রজেন্দ্রনাথেরই ছিল। তাঁর নিজস্ব মৌলিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি 'সিনথিটিক ফিলজফি' (*Synthetic Philosophy*) শব্দ প্রয়োগ করেছেন। ক্যালকাটা ফিলজফিক্যাল সোসাইটির উদ্যোগে একবার ভারতীয় দর্শনের উপর আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে তিনি পর পর তাঁর চিন্তাধারাকে এমন পরিবেশিত করেন যে, সুধীজনেরা মুগ্ধ হয়ে তাঁর মৌলিক

দৃষ্টিভংগির প্রশংসা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন 'পঞ্চম জর্জ অধ্যাপক' কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছিলেন যে, তাঁর আলোচনার মধ্যে মৌলিকত্ব দেখানোই প্রধান উদ্দেশ্য ছিলনা। দর্শনশাস্ত্রের বিভিন্ন দিকের সম্বন্ধে এতে এরূপ যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য এবং নূতনের ইঙ্গিত ছিল, যেগুলি অধ্যাপক ভট্টাচার্যের সমস্ত চিন্তাধারাকেই নাড়া দিয়েছিল। এই অধ্যাপকের মতে ব্রজেন্দ্রনাথের তত্ত্বদর্শনে জ্ঞান কেবল বহুবিস্তৃত ও তথ্যসমৃদ্ধ ছিল তা নয়, তাঁর দার্শনিক তত্ত্বকথা তাঁর সাবলীল চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে রীতিমত ভাবে শ্রেণীবদ্ধ ও সুসংগঠিত ছিল। তাঁর দার্শনিক প্রতিভা বিশ্লেষণ আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। তাই অধ্যাপক ভট্টাচার্যের প্রামাণ্য অভিমতের উল্লেখ করেই আমাদের বক্তব্য সীমিত করছি। তাঁর ভাষায়,—

"I found too that his thinking was mainly of a synoptic type which baffled me not because of his abstruseness—for he was no introvert in logic like Kant, but because of the rapidity with which it gathered momentum and because of the volume of the material it had to synthesise — material that was already a multitude of syntheses, not yet familair to his audience".

অর্থাৎ আচার্যের বক্তব্য অনুসরণ করতে গিয়ে অধ্যাপক ধাক্কা খেয়েছেন। কারণ তাঁর বক্তব্য ছিল সারমর্ম সংকলনের মতো। বিষয়বস্তু যে দুর্বোধ্য হয়ে ছিল তা নয়, কারণ তিনি ক্যাণ্টের মতো যুক্তিবিচারে আত্মগতভাবে আলোচনা করতেন না। তবে তাঁর বক্তব্যের শেষ সীমায় তিনি দ্রুতভাবেই চলে যেতেন এবং তাঁর

বিষয়বস্তুর সমন্বয়ের জন্য এত বেশী উপকরণ সংগৃহীত ছিল — যে উপকরণগুলি আবার অন্যান্য অসংখ্য বিষয়ের সমন্বয় সাধনের ফল-স্বরূপ,—এবং যেগুলি শ্রোতার কাছে আদৌ সুপরিচিত নয়,—এই কারণেই তাঁকে অনুসরণ করতে গিয়ে হটতে হয়েছিল।

ব্রজেন্দ্রনাথের রচিত একখানি উল্লেখযোগ্য গণিত পুস্তক, 'মেমোরিয়াল্ অন্ দি কোইফিসিয়েণ্ট অব্ নাম্বার্স্' (Memorial on the Co-efficient of Numbers)। গণিতজ্ঞদের কাছে এটি যথেষ্ট সমাদৃত। 'কলিকাতা গণিত সমিতির' (Calcutta Mathematical Society) মুখপত্রে তাঁর গণিত সম্বন্ধীয় মৌলিক চিন্তাধারার ফল প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ১৯২১ সালে ডি. এস্‌সি উপাধি দেন।

অধ্যয়ন ও গবেষণাকর্ম আচার্যের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই আজীবন সঙ্গী ছিল। নাম যশ বা বিশেষ মর্যাদার প্রতি কোন আকাংক্ষা বা মোহ তাঁর ছিল না, যদিও সাধনা ও কর্মের মধ্য দিয়ে আপনা থেকেই তাঁর সুনাম সারা জগতে ছড়িয়েছিল। তাঁর অতুলনীয় জ্ঞান গরিমার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯২৫ সালে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তাঁকে **'স্যার'** উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন এবং মহীশূর সরকার কর্তৃকও তিনি **"রাজতন্ত্র-প্রবীন"** উপাধিতে সম্মানিত হন।

ব্রজেন্দ্রনাথের রচনাবলী সুন্দর ও সাবলীল ইংরাজীতে লিখিত। সামান্য দু'একটি বাংলা রচনা যা পাওয়া যাচ্ছে, অনভ্যাসের দরুণ কিছু কিছু ইংরাজী শব্দ তাতে মিশ্রিত থাকলেও সেগুলি গভীর ভাব-সমৃদ্ধ এবং মনোরম। তাঁর বিশিষ্ট রচনাশৈলীদ্বারা সুধীবর্গ আকৃষ্ট না হয়ে পারতেন না। **'মডার্ণ রিভিউ'** (***Modern Review***) পত্রিকায় (জুলাই, ১৯৩০) এক অনবদ্য ও অননু-

করণীয় ভঙ্গীতে যখন তাঁর লিখিত 'গীতা' সম্বন্ধীয় বিশ্লেষণাত্মক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়, তখন চিন্তাশীল পাঠকসমাজে তা নিয়ে বেশ সাড়া পড়ে যায়। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ **স্যার মাইকেল স্যাড্‌লার** (শিক্ষা কমিশনেরও সভাপতি) ব্রজেন্দ্রনাথের রচনাবলীর (ইংরেজী) ভূয়সী প্রশংসা করেছেন প্রধানতঃ সেগুলির ভাব প্রকাশভংগির জন্য। ইনি আবার আচার্যের গুণমুগ্ধ হয়ে সশ্রদ্ধ-ভাবে বলেছিলেন, "আমি চিরদিন তাঁকে গুরুজ্ঞানে শ্রদ্ধা করব।"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যখন ইংলণ্ড ও আমেরিকায় গিয়েছিলেন, তখন পাশ্চাত্য দেশে ভারতের আধ্যাত্মিক বাণী প্রচারের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন। বিবেকানন্দের পর কয়েকজন ভারতীয় সন্ন্যাসীর নীরব প্রচেষ্টা ছাড়া ভারতের বাণী ইউরোপ বা আমেরিকার জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার কোন প্রয়াস ছিলনা। ভারত সম্বন্ধে নানারূপ বিকৃত ধারণা পাশ্চাত্যের লোকের ছিল এবং এখনও হয়তো আছে। রবীন্দ্রনাথের একান্ত ইচ্ছা ছিল এবং তিনি প্রস্তাবও করেছিলেন যে আচার্য ব্রজেন্দ্র-নাথকে অক্সফোর্ড বা পশ্চিমের অন্য কোন বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শণের অধ্যাপক হিসেবে স্থায়ীভাবে বসান হোক। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভের আগে থেকেই এরূপ একটা প্রয়াস চলছিল, কিন্তু কতকগুলি রাজনৈতিক কারনেই সেই প্রয়াস কার্যকরী হয়নি। কিন্তু একথা ঠিক যে পাশ্চাত্যের কাছে ভারতের বাণী পৌঁছে দেবার যোগ্যতম জ্ঞানসাধক ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ।

ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেউ কোন বিষয়ের আলোচনা করলে বুঝতে পারতেন তাঁর জ্ঞানের গভীরতা কত। আপাতদৃষ্টিতে যা সামান্য, আচার্যের কথাবার্তায় সেই সামান্যই এক বিরাট বিষয়ে

রূপ নিত এবং কোন বিষয়ের আবছা ধারণা সৃষ্টি করা তাঁর কথোপকথনের উদ্দেশ্য হতই না। স্বভাবতঃই তিনি ছিলেন তত্ত্বান্বেষী এবং মৌলিক চিন্তার আকরস্বরূপ। তাই কোন ছাত্র বা অধ্যাপক তাঁর সঙ্গে কোন একটি বিষয় এক সপ্তাহ আলোচনা করে যে জ্ঞান আহরণ করতে পারতেন, যে মৌলিক চিন্তার স্পর্শ পেতেন, তাতে নিঃসন্দেহে তিনি একটি 'ডক্টরেট' ডিগ্রী লাভ করতে পারতেন। দেশে আজ মৌলিক চিন্তা করবার লোকের অভাব। পল্লবগ্রাহিতা এবং পরাণুকরণ দ্বারাই অনেক পণ্ডিত পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অর্জন করছেন। পুরাতন বিষয়ের পুনরালোচনাকেই অনেকে সর্বস্ব মনে করেছেন। জ্ঞানরাজ্যের অসীম লোকে নতুনের সন্ধান করতে কজনই বা এগিয়ে আসছেন? এক্ষেত্রে আচার্য আমাদের চিরকালের দিশারী।

এই মহান জ্ঞানযোগী ও শিক্ষাব্রতী সত্যই সরস্বতীর বরপুত্র ছিলেন। তাঁর মতো সুসন্তানের জন্ম দিয়ে দেশজননী গৌরবান্বিতা আবার যে-দিন তাঁকে কোল থেকে চিরবিদায় দিতে হয়ছিল, নিশ্চয়ই তিনি তাঁর সকল সন্তানের সঙ্গে অলক্ষ্যে অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন। সেই মর্মান্তিক দুঃখের দিনটি ছিল ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৩৮।

মর্ত্যধামে তিনি নাই। কিন্তু আমাদের স্মৃতি থেকে সহজে সরে যাবার মতো ব্যক্তিত্ব তিনি নন। এ সংসারে যতদিন জ্ঞান-সাধনার প্রয়োজন থাকবে, যতদিন সভ্য মানুষ প্রতিভার আদর করবে, যতদিন ভারতীয় আদর্শের প্রতি ভারতবাসীর তথা পৃথিবীর আকর্ষণ থাকবে, ততদিন তিনি আমাদের অন্তরে অমর হয়ে থাকবেন। এই মহামনীষীকে আমরা প্রণাম করি। তাঁর শতবর্ষের স্মৃতি আমাদের চলার পথে অক্ষয় পাথেয় দিক।

"মডার্ণ রিভিয়ু" পত্রিকায় (*Modern Review, Jan., 1939*) ব্রজেন্দ্রনাথের প্রতি যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হয়েছিল, তা এখানে দেওয়া হল ঃ—

"The death of Sir Brajendra Nath Seal has removed from our midst India's greatest contemporary savant. He took all knowledge for his province and tried to master all branches of leraning and keep pace with their progress. His constant endeavour to be up-to-date in all fields of knowledge up to the day of his break-down, was perhaps one of the reasons why he was unable to leave for his contemporaries and future generations any work that can give any adequate idea of his great intellect and his versatile genins For he was not a mere learned man who had gathered in his mind the heritage of past ages. His genius was capable of new creations. Such a creation was his poetical production, The Quest Eternal, written in 1892 but published so recently as 1937. He was known as a philosopher, and a philosopher he certainly was in the most comprehensive sense, but not in any narrow sense. He wrote of the Positive Sciences of the Hindus. He wrote New Essays in Criticism.

Trying to solve problems in higher mathematics was his recreation. That he was an authority in anthropology and ethnology was acknowledged by his election to open the First Universal Races Congress in London in 1911. When he was Vice-Chancellor of the Mysore University he drew up an educational scheme for that State which embraced all stages of education from the primary to the

post-graduate University Stage, providing facilities for pursuing Vocational or Cultural courses at the end of each stage. In Mysore, too,he drew up a constitution in which the porvision for safe-guarding minority rights showed his statesmanship. The scheme for giving state aid and state encouragement to industries in the State owed much to his knowledge of matters economic and industrial.

It was to him that in the field of politics Bepin chandra Pal and others owed much of their philosophical ideas.

A whole host of pupils, some both in name and reality and others in reality, though not in name, owe him an immense debt of gratitude for ideas and materials for their works in different fields of knowledge. It is no derogation to the masterly intellect of Sir Ashutosh Mukherjee to say that but for the cooperation and collaboration of Dr. Seal, he could not have elaborated and carried to fruition many of his educational plans.

What Sir. Michael Sadler, President of the Calcutta University Commission, owed to him had better be stated in Sir Michael's own words, as published in this Review in January, 1936.

"May one of his pupils (for pupil I saw during the years 1917 19 and shall always revere him as one of my Gurus) express in a few words love and admiration for Dr. Brajendra Nath Seal, and gratitude, which grows with the years for his guidance in my thought and for what he taught me during many long and intimate discussions

about education and about the needs and genius of India ?

"He was indeed guide, philosopher and friend to me. More than fifteen years have passed since we last met in the flesh. But the feeling of his presence is still strong in my mind. So close was the friendship which he allowed to grow up between us, that I can still turn to him as if I were at his side and can hear the kindly tone of his voice. Guru indeed he was to me, and I bless his name. There are streets and lanes in Calcutta, there are paths and terraces in Darjeeling, which were the background of our talks. And, as if I were still in Bengal, I can see what I saw then and hear once more what I then heard.

"In several volumes of the Report of the Calcutta University Commission, and notably in volume 7, 9, 10 and 12, there are writings from the pen of Dr. Brajendra Nath Seal which are of permanent value and will, I hope, be reprinted (at least in part) in any future issue of his works".

Brajendra Nath Seal the man was as great as or perhaps greater than Brajendra Nath Seal the savant and the versatile genius and idealist. Pure-souled and free from guile, he was like one of our sages and seers of antiquity. At the celebration of the completion of the 72nd year of his life on December 19, 1935, striking tributes were paid to him by many distinguished persons, the most notable being the magnificent poem of Rabindra Nath Tagore addressed to him, printed at the time in Prabasi and this Review.

"প্রবাসী" পত্রিকায়ও (পৌষ ১৩৪৫) আচার্য শীল সম্বন্ধে নিম্নরূপ প্রশস্তি প্রকাশিত হয়ঃ—

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় অনেক দিন হইতে দৃষ্টিহীন ও কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া ভুগিতেছিলেন। এখন তাহার বিদেহী আত্মা রোগের যন্ত্রনা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

তিনি তাঁহার সমসাময়িক লোকদের মধ্যে যে বহু বিদ্যায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য ছিলেন, তাহা বঙ্গের বিদ্বান্ ও প্রতিভাবান লোকেরা বলিয়াছেন, আবার বঙ্গের বাহিরের সর্ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের মত বিদ্বান ব্যক্তিও বলিয়াছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিশনের সভাপতি, এবং পরে পরে বিলাতী দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার সুপণ্ডিত সর্ মাইকেল স্যাডলার শীল মহাশয়ের জীবনের ৭২ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে তাঁহাকে নিজের গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া যে প্রশস্তি লিখিয়া পাঠান, তাহার গোড়ায় আছে ঃ

আমি বাস্তবিকই ১৯১৭—১৯ সালে তাঁর ছাত্র ছিলাম এবং চিরদিন তাঁকে আমার অন্যতম গুরুজ্ঞানে শ্রদ্ধা করব। তিনি ছিলেন চিন্তার ক্ষেত্রে আমার পথ নির্দেশক। ভারতের প্রকৃত অভাব বা প্রয়োজন কি এবং ভারতীয় প্রতিভার দান কি এ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে বহু দীর্ঘ এবং অন্তরঙ্গ আলোচনার মাধ্যমে তিনি আমায় নানা কথা শিখিয়েছিলেন। তাঁর ছাত্রমণ্ডলীর একজন হিসেবে আমি কি তাঁর প্রতি আমার ভালবাসা, শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা, যা আমার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বর্ধিতই হচ্ছে, জানাবার সুযোগ পেতে পারি ? .... সত্যই তিনি আমার কাছে ছিলেন আমার চালক, জ্ঞানদাতা এবং বন্ধু।"

স্যাডলার সাহেবের সমগ্র প্রশস্তিটি ১৯৩৬ সালের জানুয়ারী মাসের 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে আছে। ঐ সংখ্যায় এবং ১৩৪২ সালের মাঘের প্রবাসীতে তাঁহার উদ্দেশে লিখিত রবীন্দ্রনাথের সেই অপূর্ব কবিতাটি প্রকাশিত হইয়াছিল, যাহার আরম্ভে আছে—

"জ্ঞানের দুর্গম উর্দ্ধে উঠেছ সমুচ্চ মহিমায়,
যাত্রী তুমি, যেথা প্রসারিত তব দৃষ্টির সীমায়
সাধনা-শিখরশ্রেণী।"

তিনি যে শুধু পণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে। তাঁহার প্রতিভা ছিল এবং তাহা বহুমুখী। তাঁহার ইংরেজী কবিতাগ্রন্থ The Quest Eternal গত বৎসর অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়, যদিও তাহা লিখিত হইয়াছিল ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে। ধর্ম, দর্শন ও কাব্যেই প্রাচীন ভারতীয়েরা উন্নতি করিয়াছিলেন বলিয়া পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতবর্গের ধারণা। আচার্য শীল রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান প্রভৃতিতে প্রাচীন হিন্দুদের জ্ঞানের বৃত্তান্ত লিখিয়া সেই ধারণার ভ্রম দেখাইয়া দেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে যে সর্ব নৃ-জাতি-কংগ্রেস (Universal Races Congress) হয়, তাহার উদ্বোধন করিতে আহূত হইয়া তিনি নৃতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্বাদি বিষয়ে গবেষণাপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেন। উচ্চ গনিত অনুশীলন ছিল তাঁহার চিত্তবিনোদনের উপায় (recreation)।

মহীশূররাজ্যের তৎপ্রণীত রাষ্ট্রবিধিতে সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ প্রভৃতির ব্যবস্থা তাঁহার রাজনীতি বিশারদত্বের পরিচায়ক। ঐ রাজ্যের জন্য তৎপ্রণীত শিক্ষা-পদ্ধতিতে প্রাথমিক হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পর্যন্ত সংস্কৃতিমূলক ও বৃত্তিমূলক উভয়বিধ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। তখনকার শিল্পোন্নতির জন্য সরকারী সাহায্যদান ব্যবস্থাতেও তাঁহার হাত ছিল।

বঙ্গে বিপিনচন্দ্র পালের মত বাগ্মী ও রাজনীতিবিদ আচার্য শীলের নিকট হইতে স্বাজাতিকতার দার্শনিক তত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন। বস্তুতঃ স্যাড্‌লার সাহেব যেমন সরল ভাবে তাঁহার নিকট ঋণ স্বীকার করিয়াছেন, বিদ্যার অনেক শাখার বহু ভারতীয় গ্রন্থকারও তাঁহার নিকট সেইরূপ ঋণী। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার যাঁহারা ছাত্র ছিলেন, তাঁহারা তো ঋণী আছেনই। অবস্থাচক্রে ও তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, মনস্বিতা ও প্রতিভার অনুরূপ গ্রন্থাবলী তিনি লিখিয়া যাইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু যেমন বড় ব্যাংকের সাহায্যে বণিকেরা ও ছোট ছোট ব্যাংক নিজ নিজ কারবার চালায়, তেমনি অনেকে তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার ও প্রতিভার আনুকূল্যে নিজ নিজ সাংস্কৃতিক কারবার চালাইয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য, মনস্বিতা, ও প্রতিভা যেরূপ অসামান্য ছিল, তাঁহার স্বভাব ছিল সেইরূপ সরল, নম্র ও সৌজন্যপূর্ণ, এবং চরিত্র ছিল সেইরূপ উদার, মহৎ ও পবিত্র।

"মাসিক বসুমতী" ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের—

মৃত্যুতে লেখেন :—

গত শনিবার ১৭ই অগ্রহায়ণ বরেণ্য জ্ঞানবীর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছল। তাঁহার বিয়োগ শুধু বাঙ্গালার নহে, সুসভ্য দেশ সমূহের বিদ্বজ্জনসমাজের এক অতুচ্চ শৃঙ্গ খসিয়া পড়িল।

পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানে ব্রজেন্দ্রনাথ যে মনীষার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সুদুর্লভ। বহু ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞানলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অবাধ অধিকার ছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মানসহকারে পাঠ সমাপ্ত করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ সিটি কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য গ্রহণ করেন, এক বৎসর অধ্যাপনা করিবার পর তিনি নাগপুর মরিশ কলেজে অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেন। বহরমপুর কলেজে অধ্যক্ষের আসন গ্রহণ করিবার জন্য আহূত হইয়া তিনি নাগপুর হইতে বহরমপুর আসিলেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব দক্ষতার সহিত সম্পাদন করেন।

অতঃপর ব্রজেন্দ্রনাথ কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহন করিয়া ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি "সত্যের পরীক্ষা" শীর্ষক এক জ্ঞানগর্ভ পুস্তিকা রচনা করেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে রোমনগরে প্রাচ্য বিদ্যাবিদগণের এক আন্তর্জ্জাতিক কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁহার এই প্রসিদ্ধ পুস্তিকা পঠিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত "বৈষ্ণবধর্ম ও খৃষ্টধর্ম" "আইনের আরম্ভ ও সমাজনীতির সংস্থাপক হিন্দু" নামক দুইটি সুচিন্তিত উপাদেয় প্রবন্ধ ও এই কংগ্রেসের ইতিহাস বিভাগে পঠিত হইয়াছিল। এই সকল রচনায় তিনি যে মনীষা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা অনন্যসাধারণ।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহাতিশয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে "পঞ্চম জর্জ

অধ্যাপকপদে'' নিযুক্ত হইয়া ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠত ছিলেন। তাহার পর তিনি মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। মহীশূর রাজ্যের শাসন পদ্ধতির খসড়াও তাঁহার রচিত। তাঁহার প্রতিভামুগ্ধ মহীশূর দরবারে এই গুরু দায়িত্ব-ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। মহীশূর দরবার তিনি শাসন পরিষদের আসনও গ্রহন করিয়াছিলেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মহীশূর দরবার কার্য হইতে অবসর গ্রহন করেন। সেই সময়ে তিনি নাইট (·রাজতন্ত্র প্রবীন) উপাধি লাভ করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ অনেকবার য়ুরোপে গমন করিয়াছিলেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "লণ্ডন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সমূহের কংগ্রেসে" আলোচনা আরম্ভ করিবার গৌরবজনক আসন লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম রচনার জন্য যে কমিটী গঠিত হইয়াছিল, তাহাতেও তিনি কার্য করিয়াছিলেন।

রামমোহন শতবার্ষিকী, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শত-বার্ষিকীতেও তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ধর্ম্ম সম্মেলনের এক দিনের অধিবেশনে তিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

বিগত ১৯৩৫খৃষ্টাব্দে ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসে তঁহার ৭২ বৎসর বয়স উপলক্ষে এক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

ব্রজেন্দ্রনাথ অসাধারণ জ্ঞান ও মনীষার উপযুক্ত রচনসম্ভারে বাঙ্গালাভাষাকে সমৃদ্ধ করিতে পারেন নাই; কিন্তু তিনি জ্ঞান-পিপাসুকে অকাতরে তঁাহার সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিতেন। তাঁহার রচনা-সম্ভার প্রচুর না হইলেও, যাহা তিনি দিয়াছেন, তাহার তুলনা হয়না।

৭৬ বৎসর বয়সে ব্রজেন্দ্রনাথ দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে বাঙ্গালার যে ক্ষতি হইল তাহা কখনও পূর্ণ হইবে কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। জ্ঞানের যে বিপুলরশ্মি সম্প্রসারিত হইতে-ছিল, তাহা এতদিনে নির্বাপিত হইল।

[**মাসিক বসুমতী, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫**]

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের জয়ন্তী

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের ৭২ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে ভারতবর্ষীয় দার্শনিক কংগ্রেসের উদ্যোগে গত মাসে কলিকাতায় তাঁহার জয়ন্তী হইয়া গিয়াছে। ডাঃ স্যার্ নীলরতন সরকার মহাশয় এই জয়ন্তীর সভায় সভাপতি মনোনীত হন এবং আচার্য শীল মহাশয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার এই প্রশস্তি কোন কাগজ রিপোর্ট করে নাই। অন্য প্রশস্তিগুলিরও যে রিপোর্ট ঠিক ঠিক বাহির হইয়াছে তাহা নহে। মহীশূরের অধ্যাপক কে. ভি. মাধব, ঢাকার অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য প্রভৃতি যে কিছু বলিয়াছেন, তাহার উল্লেখ পর্যন্ত দেখি নাই।

আচার্য শীল মহাশয়ের প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তা যেমন বহুমুখী, মননশক্তি যেমন অসাধারণ, স্বভাব তেমনি সরল এবং চরিত্র তেমনি উদার, মহৎ ও পবিত্র। ইহা সাতিশয় ক্ষোভের বিষয় যে অবস্থা চক্রে এবং তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও মনস্বিতার অনুরূপ কোন গ্রন্থ তিনি লিখিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহা বিদ্বন্মণ্ডলীর পরিজ্ঞাত যে, যেমন ছোট ছোট বহু ব্যাংক বৃহৎ ব্যাংকের আনুকূল্যে নিজেদের কারবার চালায়, তেমনি বিদ্যার অনেক শাখার বহু গ্রন্থকার তাঁহার নিকট হইতে সংকেত, উপদেশ ও চালনা প্রাপ্ত হইয়া যশস্বী হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সভাপতি বৃটেনের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ স্যার্ মাইকেল স্যাড্লার আপনাকে শীল-মহাশয়ের শিষ্য বলিয়া যে প্রশস্তিটি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহা জানুয়ারী মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথও প্রশস্তি হিসাবে তাহার অপূর্ব কবিতাটি পাঠাইয়াছিলেন।

সমুদয় অভিনন্দনের উত্তরে আচার্য শীল যাহা বলেন, তাহাতে প্রথমেই ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক বিবাদ কলহে গভীর ব্যাথা প্রকাশ করেন। তৎপরে জয়ন্তীর বিদেশে ও দেশে ইতিহাস ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু বলেন। শেষে তাঁহার জীবনের বাহ্য ফলহীনতা সম্বন্ধে শান্ত ও গভীর ভাবে প্রানস্পর্শী কয়েকটি কথা বলেন। এই দর্শন কংগ্রেসে মারাঠী অধ্যাপক দামলে, স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড ডক্টর আর্কুহার্ট (W. S. Arkuhurt) ও মাদ্রাজ খৃষ্টান কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ এ. জি. হগ প্রমুখ বহু সর্বভারতীয় পণ্ডিত ব্যক্তি আচার্যকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন।

প্রবাসী, মাঘ, ১৩৪২।

—ঃ পরিশিষ্ট ঃ—

কলিকাতায় বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে প্রদত্ত ব্রজেন্দ্রনাথের অভিভাষণ ঃ—

Dear Friends,

The Parliament of Religions that is commencing today, is one of the items, perhaps the last item in the programme of yearlong celebration in connection with the Centenary of the birth, or as others would have it, the advent into this world of Paramahamsa Ramakrishna.

More than 25 years ago I recall having written at Sister Nivedita's request a paper entitled "An early stage of Vivekananda's Mental Development". I concluded that paper with an acconnt of a visit I had paid to Vivekananda's Master, Sri Ramakrishna. That was a stormy evening and it was aecompanied by thunder and lightning, and this suited well my mental commotion which was created in me by that visit. This afternoon in the calm dispassion of the evening of my life, I deem it a privilege to be able to share along with the thousands who are present in this hall in person or in spirit the Centenary celebration of one who in his sojourn on earth was above time and above space.

This Parliament of Religions has evoked cordial responses from far and near. The participants who are present in person are going to deal with the problems of religion, life, moral welfare, spirituality and social progress from varied points of view. The teachings of Ramakrishna constitute the topic of some of the papers to be presented before the assembly. I shall confine myself to recording just a few reminiscences of mine in regard to the great saint as well as placing in the philosophical and historical perspectives his special contributions to the realm of human thought and action.

In his early boyhood Ramakrishna took part in popular shows and exhibitions, e. g., Krishnalila and Gajan songs. He would play the part of Krishna or Siva in these popular shows. On the death of his elder brother, he became priest at the Kalibari (temple of Kali) of Dakshineswar near Calcutta. He wanted to see Kali, the Divine Mother, and threatened to stab himself to death if Kali would not deign to appear. He was half-mad and at last he had, as he thought, a vision of Kali.

He then began to practise austerities. He

took on himself a vow to abjure lust and gold (Kama and Kanchana). Taking gold in one hand and mud in the other, he would mutter, 'Gold is mud and mud is gold'. In the sme way he conquered all cravings of the flesh and in the end he revered every woman as mother.

A youthful and beautiful woman initiated him into Tantric practices (Sadhana). Lying on her lap he meditated on Kali. She was a Brahmacharini, using wine and flesh in the rituals of worship. He worshipped her as a naked Goddess. All sensual cravings were thus seared and burnt up in him. He sought to experience each religion in its entirety in Sadhana or spiritual discipline. Now he would be Moslem Fakir, with appropriate rituals, attitudes and garb, and now a Christian neophyte, stricken with a sense of sin and crying for salvation. There was nothing of mere pose or mere imagination in all this. In the same way Vaishnava Sankirtan and music were added to his religions exercises.

Among early personal influences on Ramkrishna is to be noted that of Saint Dayananda Saraswati, founder of the Arya Samaj. Dayananda took his stand on the Vedas as teaching the one Universal Religion and fought all idolatry in a militant mood, but his influence on Ramkrishna could not be be lasting or deep. Ramkrishna's genuineness led him to revolt against Hindu practices; he would repudiate caste and even serve the "Methar" which could hardly have been pleasing to the orthodox Vedic

brotherhood. He felt himself drawn to Totapuri and other saints and then manifold experiences prepared him for his mission in life It was Totapuri who initiated him into Sannyasa.

He came under the influence of the Brahmo Samaj also. The New Dispensation as preached by Brahmananda Keshabchandra gave him a keen sense of certain social evils and immoralities which had corrupted latter-day Hindu religion and religious practices.

Ramakrishna was a composite personality. In contemplaling Truth from the absolute point of view (Nirupadhi) he negatived all conditions and modes (Upadhis), but from the relative or conditional point of view (Sopadhi) he worshipped Kali, the Divine Mother, as well as other modes and embodiments of the deity. He worshipped the one in all and the all in one, and he saw no contradiction but only a fuller reality in this. So also he reconciled 'Sakar' and 'Nirakar' Upasana. For him there was nothing in the material form of the deity but God manifesting Himself. The antagonism between matter and spirit did not exist for him

What he refused to delude himsesf with was that he was above all conditions and all infirmities of the flesh. But in his trances (Samadhi) he developed ecstasia in its purest form, such as has been rarely witnessed in the West in the religious world since the days of Eckhart and Taculer.

Like most Hindu Saints he had an inexhaustible store of homely sayings, adages, metaphors, allegories, parables, which could bring spiritual truths home to the meanest understanding and even to the child.

Rammohun Roy, in a very real sense the father of modern India, sought the Universal Religion, the common basis of the Hindu, Moslem, Christian and other faiths. He found that each of these great religions was based on this common faith with a certain distinctive historical and cultural embodiment. It is fundamental to note that Rammohun played two roles in his own person. First he was a profound Universalist and in this capacity he formulated the creed of what has been called Neo-theophilanthropy (a new love of God and man) on positive and constructive lines. He construed the Gayatri on this basis. And strange to say, this Hindu became one of the three fathers of the Unitarian creed and worship in the west.

In the second place Rammohun was a Nationalist reformer and functioned in three different ways.

As a Hindu Reformer he gave a Uuitarian redaction of the Hindu Shastras from the Vedanta and as a Moslem defender of faith he wrote the Tufatul Mowahidin and Manazaratum Adiyan which were polemecal works. And finally as a Christain he gave a Unitarian version of the entire body of the scriptures, old and new, in his controversies with the Christian Missionaries Rammohun was thus himself a universalist and three nationalists all in one.

Maharshi Devendranath organised the creed, rituals and Anusthanas in the Adi Brahmo Samaj on a Hindu Upanishadic basis.

The work of formulating a Universal Religion free from Hindu or Christian theology fell to Brahmananda Keshab Chandra Sen, who attempted this on an electic basis, and thus organised rituals and modes of worship. In his earlier days Keshabchandra made Christianity the central religion but in later life he was drawn more and more to Vaishnavism for emotional and religious exercises. This was selective eclecticism. He thus variegated and fulfilled religious experiences as well as concepts, rituals and worship in a way never attempted before. Buddhism, Christiaity, Islam and Vaishnavism, not to mention other religions, each contributed its essence and substance to Keshabchandra's Religion of the New Dispensation and what was new was the electic cult and culture.

The next step (and it was indeed a fundamental innovation) was taken by Paramahansa Ramakrishna. The Paramahansa would experience each cult and religion in its totality or as one whole experience. ... ...

The New Dispensation would select the 'distinctive' central essence from each religion and make a collection, a 'boquet' of followers as it were. Here it was that Ramkrishna differed from Keshab Chandra. Indeed he differed fromt his predecessors in two essential respects. First, he maintained that the practices of each religion with its

rituals and disciplines gave its essence more really and vitally than its theoretical dogmas or creeds. Secondy, it was Ramakrishna's conviction that it is not by selective eclecticism but by syncretism and the whole-hearted acceptance of a religion, that its full value and worth could be realized ond experienced.

Ramakrishna held that selective extracts would kill the vital element in each religion. He would be a Hindu with the Hindu, Moslem with the Moslem and a Christian with the Christian in order to experience the whole truth and efficaey of each of these religions. But he would not practie different religions, disciplines or hold different creeds at one and the same time. The observances, practices and rituals of each riligion are organic to it He would tentatively accept the whole creed and ritual of the Moslem (or of the Christian Catholic) in order to experience its religious efficacy and truth. In all these there might be temptations and pitfalls but one must be as an innocent child or babe and pass unscathed through fire. It was thus that the Paramahams passed succesively through Christian and Moslem experiences. Such was the Paramahamsa's syncretism.

Ramakrishna was thus a cosmic humanist in religion and not a mere nationelist. He gave the impulse initiative to universal human and this must be copmleted in our age. Humanism has now various new phases and developments. Leaving out Comte's positivistic humanism with its

worship of the "grande-etre" and Bahaism with its later offshoot "Babism", the religion of human brotherhood ('bhai'), we may turn to later phases such as the new concepts of religion without a God (as in Julian Huxley). This is not all. Impersonal ideals of Truth, Beauty or Godness have sometimes replaced the old faith in a personal God. And it is not merely the religious sentiment which claims its own pabulum in our day. A passion for Science, for philosophy or for scientific philosophy, a passion for art or for Rasa (aesthetic sentiment) in general is the badge of modernism in our culture and seeks to displace much of the old religious sentiment.

Our present quest is for a Parliament of Religions, a quest which we seek to voice in this Assembly. But this is only a stepping stone to a Parliament of Man or a Federation of World Cultures.

Articles of faith, creeds and dogmas divide man from man but we seek in religion a meeting ground of humanity. What we want is not merely universal religion in its quintessence, as Rammohun sought it in his earlier days, not merely an electic religion by compounding the distinctive essence, theoretical as well as practical, of the different religions as Keshabchandra sought it, but experience as a whole as it has unfolded itself in the history of man. And this can be realised by us, as Ramakrishna taught, by the syncretic practice of religion by being a Hindu with the Hindu, a Moslem with the Moslem and a Christain with

the Christian a preparatory to the ultimate realisation of God in Man and Man in God.

Religion in a broader sense is to be distinguished from the religions in the concrete. As such, it is a force that organizes life and life's activities. All cultures and in fact, all concepts are dominated by the idea of religion. Food, sex-relations, the family, tribal life and warfare are all regulated by the religious idea. Empirical science and folk life are grouped round the central idea of religion. And, in the course of progress, the higher religions are evolved. The Parliament of Religions is thus to be conceived as but the apex of this ascending course of religious evolution.

Religious expression, however, is not the only expression of the ultimate experience. We have also science, philosophy or better scientific philosophy, art or the aesthetic sensibility, (Rasa sentiment or Rasanubhuti) or mystical experience, all these being phases of humanism. And the consummation is to be found in cosmic humanism which frees mankind from its limitations of outlook by finding man in the universe and the universe in man. And we must seek it to be free not of this or that state but of the solar system and stellar systems and beyond, in one word, of the universe.

Our immediate objective today is a Parliament of Religions. But in my view this is only a prelude to a larger Parliament, the Parliament of Man, voicing the federation of world cultures, as I have said, and what this will seek to establish is a synthetic view of life conceived not statically but dynamically as a progressive evolution of humanity.

ব্রজেন্দ্রনাথের অভিভাষণ সম্পর্কে কয়েকটি পত্র-পত্রিকার মন্তব্যঃ—

i) Amrita Bazar Patrika:- Feb, 28, 1937.

"For the first time in the history of modern India the Parliament of Religions will be held in Calcutta in the Town Hall on Monday, the Ist of March".

"In the circumstancs, Sir Brajendra Nath Seal, the great Indian Philosopher and savent; has been chosen to be the General President of the Parliament, and we have no doubt that the choice has been happy. For, besides, his international reputation as a scholar, Sir Brajendra Nath treasurs in his mind many reminiscenes of Sri Ramakrishna and was also intimate with Swami Vivekananda, the chief disciple of the Saint of Dakshineswar".

* * * * *

ii) The Advance, March, 2, 1937.

"For understanding what those teaching mean to India and to the world, particularly in the context set by the Parliament of Religions, we would refer the reader to the remarkable address of Sir Brajendra Nath Seal, the Doyen of Indian Philosophers, delivered at the Parliament as its President. We can do no better than quote the President's exact words for it would be impossible for us to improve on them :

"What we want is not merely universal religion in its

quintessence, as Rammohun sought it in his earlier days, not merely an electic religion by compounding the distinctive essences, theoretical, as well as practical, of the different religions as Keshabchandra sought it, but experience as a whole as it has unfolded itself in the history of man. And this can be realized by us, as Ramkrishna taught, by the syncretic practice of religion by being a Hindu with the Hindu, a Moslem with the Moslem and a Christian with the Christian as preparatory to the ultimate realization of God in Man and Man in God".

(Sir Brajendra Nath Seal)

And there can be no country in the world so fit to be the scene of the labours of a Parliament of Religions as our own country which has welcomed with open arms the advent of every riligious idea. Of that universal spirit, the teachings of Ramakrishna stand as the aptest representative, for, as Dr. Seal pointed out, Ramakrishna was a cosmic humanist in religion and not a mere nationalist".

iii) the Statesman, March, 3, 1937.

"Religion, said Sir Brajendra Nath Seal in his Presidential address on Monday, is in its broader sense a force that organizes life and life's activities, and Sri Ramkrishna's teaching and living were a protest against a narrower conception of religious duty that has done great evil the world over".

iv) The Bombay Chronicle, March 5, 1937.

"What then is the escape from this tragedy of strife in the name of religion ? Sir Brajendra Nath Seal, one of the greatest living philosophers of India, who presided ever the Parliament on Monday, answers the question thus"—

"What we want is not merely··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···Man in God."

—আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের স্মৃতি—

"এই সময়ে (১৯০৮) আমার মনে হইল যে, "হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাসের প্রতিশ্রুত দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করা আমার পক্ষে কর্ত্তব্য। তদনুসারে আমি তৎ সম্বন্ধে — কতকগুলি নূতন সংগৃহীত পুঁথি পাঠ করিতে লাগিলাম। সৌভাগ্যক্রমে ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সহযোগিতা লাভেও আমি সমর্থ হইলাম। ডাঃ শীলের জ্ঞান সর্বতোমুখী, তিনি প্রাচীন হিন্দুদের 'পরমাণুতত্ত্ব' সম্বন্ধে একটি অধ্যায় লিখিয়া দিলেন। এই অংশ পরে সংশোধিত ও পরিবর্ধিত করিয়া ডাঃ শীল তাঁহার Positive Sciences of the Ancient Hindus" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে প্রকাশ করেন।

—আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়

আত্মচরিত, পৃ—১২৬।

"বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীরা নিজেদের খুবই উচ্চ-শ্রেণীর জীব বলিয়া মনে করে বটে, কিন্তু এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে তাহাদের তুলনা করিলে, অনেক স্থলেই তাহাদের সে ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দর্শনশাস্ত্রের কথা ধরা যাক। ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের নাম অবশ্যই এক্ষেত্রে সর্বাগ্রগণ্য। তাঁহার বিরাট-জ্ঞান ভাণ্ডার ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র-শিক্ষার্থীদের চিত্তে ঈর্যা ও নৈরাশ্যের সঞ্চার করে। তাঁহার সমকক্ষতা লাভের কল্পনাও তাঁহারা করিতে পারেন না। একথা সত্য যে, তিনি এমন কোন গ্রন্থ প্রকাশ করেন নাই, যাহার দ্বারা তাঁহার নাম প্রসিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু কয়েক পুরুষ ধরিয়া যে সব ছাত্র তাঁহার পদমূলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ডঃ শীলের নিকট তাঁহাদের অশেষ ঋণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। তিনি সক্রেটিসের মতই তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্য দিয়া জ্ঞানরশ্মি বিকীর্ণ করেন।

রবীন্দ্রনাথ ডঃ শীলকে জ্ঞানের মহা সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। কত জন যে তাঁহার পদমূলে বসিয়া শিক্ষা লাভ করিয়া প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইয়াছেন, তাহা অনেকেই জানেন। কেবলমাত্র তাঁহার মৌখিক উপদেশ শুনিয়াই বহু ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টর' উপাধি লাভ করিয়াছেন।

—আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়
আত্মচরিত, পৃ— ২৪১-৪২।

—ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতি-

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। নিবেদিতা প্রসঙ্গে আচার্য লিখেছেন,—

"নিবেদিতা ছিলেন বিবেকানন্দের উপসংহার। কিন্তু উপসংহার বলিয়া তিনি ঠিক বিবেকানন্দের প্রতিরূপ ছিলেন না। নিবেদিতার জীবনেব সামান্য মাত্রও স্পর্শ যাঁহারা পাইয়াছিলেন, তাঁহারাই সেই জ্যোতির্ময় জীবনের বিশালতা, গভীরতা ও শক্তি সঞ্চার দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। একটি দুর্লভ সর্বতোমুখী ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ আমরা পাই নিবেদিতার মধ্যে। নিবেদিতার চরিত্রে এবং চিন্তায় দেখিয়াছি ভারতীয় ভাবধারা এবং সাংস্কৃতিক মহিমার সহিত আধুনিক ভাবধারাও উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ না করিয়াও নিবেদিতা ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, — ইহা তাঁহার পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। ভারতের শিক্ষা কি, সাধনা কি, সমাজের মর্মকথা কি, তাহা তিনি তেমন করিয়াই বুঝাইতে চাহিয়াছেন, যেমন করিয়া বুঝিলে আমরা যথার্থ ভারতীয় হইয়া উঠিতে পারি। —এক বিদেশিনীর পক্ষে ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে।"